

দাম: এক টাকা



আষাঢ় • ১৩৬৯


কষ্টদায়ক
সর্দি কাশির
দ্রুত আরামের
জন্য বি. আই. কফ
সিরাপ ব্যবহার করুন
বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী



সুলেখা
আজ আমাদের জাতীয় সম্পদ
গুণগত উৎকর্ষে সুলেখার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। অগণিত জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থনধন্য সুলেখা আজ সব চেয়ে বেশী বিক্রয়ের গৌরবে গৌরবান্বিত। স্বদেশী শিল্পের একটি একান্ত প্রয়োজন মেটাতে পেরে সুলেখা আজ জাতীয় সম্পদে পরিণত।
কালির সেরা সুলেখা
সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ



লিলির
নোনতা
বিস্কুট
উপাদেয়, মুখরোচক
NONTA
AIR-TIGHT CARTON
লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪



Mritusanjibani
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
(৬ বৎসরের পুরাতন)
মৃতসঞ্জীবনী





সূ চী প ত্র

আষাঢ়

প্রচ্ছদ : সত্যজিৎ রায়　　চিত্র : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

নিবেদন

গ্রাহকদের প্রতি

- পত্রিকা সাধারণত ইংরিজি মাসের দশ তারিখে প্রকাশিত হয়।
- প্রকাশিত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুগ্রহ করে খোঁজ নেবেন।
- সন্ধান না পেলে চিঠি দেবেন। আমরা আর একবার পাঠাবার চেষ্টা করব।
- এতৎসম্পর্কে মুখে বা ডাকযোগে অনুসন্ধানকালে অনুগ্রহ করে এবং অতি অবশ্য আপনার গ্রাহক-সংখ্যার উল্লেখ করবেন।

লেখকদের প্রতি

- লেখা সবসময় সম্পাদক : 'পরিচয়' —এই নামে পাঠাবেন।
- সম্পাদনা সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠিপত্র সম্পাদক 'পরিচয়'
  ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
  কলকাতা-৭
  এই ঠিকানায় পাঠাবেন।
- উপযুক্ত ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে রচনা সম্পর্কিত মতামত জ্ঞাপন, অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো ও চিঠির উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।
- ছ মাসের বেশি অমনোনীত পাণ্ডুলিপির দায়িত্ব আমাদের পক্ষে বহন করা সম্ভব হয় না।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

- বিজ্ঞাপনের হার ও অন্যান্য নিয়মাবলীর জন্য কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে পত্রালাপ করুন।

পরিচয়

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-৭



শিল্পী : নরেন্দ্রনাথ মল্লিক

পরিচয়
বর্ষ ৩১। সংখ্যা ১২
আষাঢ়। ১৩৬৯

কয়েকটি নায়ক : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

ঔপন্যাসিকের জীবনভাষ্য প্রতিফলিত হয় ঘটনা নির্বাচনে, পরিণামী সংবেদনায় এবং প্রসঙ্গত কাহিনী বিবৃতির ফাঁকে ফাঁকে উচ্চারিত মন্তব্যে। লেখকের মানসপ্রবণতা এইভাবেই উপন্যাসমধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নায়ক নায়িকার চরিত্রবিশ্লেষণে অনুস্যূত হয়ে পড়ে। ঔপন্যাসিকের প্রত্যক্ষভাষণে না থাকলেও তাই উপন্যাসের শিল্পরূপ থেকে লেখকের জীবনসমালোচনা ও সারস্বতপ্রত্যয় উপলব্ধি করা যায়। চন্দ্রশেখরের প্রারম্ভিক উক্তি "বাল্যপ্রণয়ে অভিসম্পাত আছে" অথবা উপসংহার, "তবে যাও, প্রতাপ, অনন্তধামে। যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেখানে যাও"—বঙ্কিমচন্দ্রের নৈতিক আদর্শ ব্যক্ত করে। শরৎচন্দ্রের বহু উপন্যাসের অংশও অনুরূপভাবে উৎকলিত হতে পারে, দেবদাসের উপসংহারটিও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

যদি জীবনজিজ্ঞাসায় নতুন কোনো দিগন্ত লেখকের চোখে পড়ে, যেখানে দাঁড়িয়ে মনে হয়, পূর্বের পথ চলায় ফাঁকি না থাকলেও ফাঁক ছিল, জীবন ও জগতকে চেনার দৃষ্টি ছিল না স্বচ্ছ, তাহলে লেখকের জীবনধারণায় পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিল্পীমানসেও ঘটবে গোত্রান্তর। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব পর্যায়ের রোম্যান্টিক উপন্যাসের নরনারী, সামাজিক উপন্যাসের নায়ক নায়িকা এবং শেষ ত্রয়ীর হিন্দুঐতিহ্যমণ্ডিত চরিত্র লেখকমানস-বিবর্তনেরই পরিচয় দেয়।

বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় পর্যায়ের চারটি উপন্যাস : 'হলুদ নদী সবুজ বন', 'ইতিকথার পরের কথা', 'মাঝির ছেলে',

'শান্তিলতা'। তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসবাদে দীক্ষিত। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের মোহ ত্যাগ করে তিনি পূর্ণজীবনের সন্ধানে শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের জীবনসংগ্রামে শরিক হয়েছেন। "কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা" অর্জন করা দুরূহ। তবু মানিকবাবু সেই দুরূহের সাধনায় আমৃত্যু নিরলস ব্যাপৃত ছিলেন।

উপন্যাসের ভাষা, দৃশ্যবৎ বর্ণনা, মৌলিক উপমারীতি—এইসব দিকে খুঁটিনাটি বিচ্ছিন্ন করে দেখানো কঠিন নয় যে মার্কসবাদের সংস্পর্শে এসে মানিকবাবুর শিল্পীসত্তা নির্জিত হয়েছে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সংহতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে অনেক ছোট-বড় চরিত্রের মেলায়, সমাজপ্রেক্ষিতের ওপর বেশি জোর দিতে গিয়ে মনের জগৎ হারিয়ে গেছে অতি-সরলীকরণে। পদ্মানদীর মাঝিদের যে উদ্দাম জীবনবেগ অথবা শশী-কুসুম মতি-কুমুদের জৈব অনুভূতি একজন শক্তিমান কথাশিল্পীর ব্যঞ্জনাসঞ্চারী কলমের পরিচয় দেয়, তার বিশিষ্টতা যেন আর নেই। সত্যিই কি নেই? এ-প্রশ্নের উত্তরে শেষ পর্যায়ের গল্প-প্রসঙ্গে আলোচনা স্মরণ করা যেতে পারে। "পুরনো জীবন ত্যাগের পরেও থাকবে পুরনো পরিচ্ছদের মোহ? সাঙ্কেতিক ভাষা, তির্যক মন্তব্য, উপসংহারের বিদ্যুদ্দীপ্তি তো তৃতীয় পর্বের বাহন হতে পারে না। নেতি-বাচনের উপমা উৎপ্রেক্ষা সংলাপ যতই বলিষ্ঠ হোক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোত্রান্তর স্বীকার করলে এই পর্বে তা বরং ন্যায়ত প্রত্যাশিত নয়। নতুন সমাজচেতনা প্রতিষ্ঠার পূর্বে তার সার্থক ভাষা আসে না।" তৃতীয় পর্যায়ের উপন্যাসেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন রচনাশৈলীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। কিন্তু তিনি যে এতদিনের সংস্কারের মোহ থেকে প্রায় রাহুমুক্ত হয়েছিলেন, এ সত্যটিই তাঁর পূর্ণজীবনসন্ধিৎসার সাক্ষী।

তাই তৃতীয় পর্বে নতুন ধরণের কিছু নায়ক চরিত্র পাই। 'ইতিকথার পরের কথা'র কৈলাস, 'হলুদ নদী সবুজ বন'-এর ঈশ্বর-এর পথে নিঃসন্দেহে বাঙলা উপন্যাসে নতুন নায়কের পদধ্বনি শোনা গেছে। সুখেন্দুও [শান্তিলতা] মধ্যবিত্ত থেকে শ্রমিকস্তরে পরিবর্তিত নায়ক, নাগা, নকুলের সমস্তরে এসে দাঁড়িয়েছেন 'ভদ্রলোক মাঝি' যাদববাবু [মাঝির ছেলে]।

চরিত্রচিত্রণে নতুন মূল্যবোধ, নতুন বক্তব্য পরিস্ফুট হলেই শিল্পীর গোত্রান্তর সাফল্য অর্জন করে। প্রথমে একটু ছকঘেঁষা পুঁথিগত ধারণা দিয়েই গড়তে চেয়েছেন নতুন চরিত্র। চরিত্রগুলি পরিকল্পনার নেপথ্যে যে শিল্পী-

বিধাতার মন সক্রিয়, সেই "মনের কারখানা ঘরে" তখন যে সামাজিক রাজনৈতিক প্রশ্ন সমাধানের প্রত্যাশী, তাদের প্রকাশ ঘটেছে চরিত্রায়নে। কিন্তু তারা যেন চলাফেরা কথাবার্তার সময় পেছন ফিরে লেখকের উপস্থিতি এবং অভিপ্রায় বুঝে নিতে চেয়েছে। তাই দেখি 'নাগপাশ'-এর আখ্যানভাগ অত্যন্ত শিথিল। অধ্যায় থেকে অধ্যায়ান্তরে অগ্রগতি অনিবার্য বা সাবলীল নয়, বহু ঘটনা ও চরিত্র যেন লেখকের কয়েকটি ধারণাসূত্রে ক্ষীণভাবে সংলগ্ন। স্বাভাবিক গতি পদে পদে ব্যাহত। নরেন, ছবিরানী, নন্দন, সন্ধ্যা, মহেন্দ্র, গৌরী, দীননাথ, মাধব, মানসী কয়েকটি বিচ্ছিন্ন নরনারী, আপতিক ঐক্যসূত্রে মিলিত। মধ্যবিত্ত যুবক নরেন্দ্র তার মনের শ্রেণীচ্যুতি ঘটানোর জন্যেই যেন গ্রামের প্রতিবেশী দীননাথের ছেলে মণ্টুর সঙ্গে বস্তিতে বাস করল। মাধব অসাধারণ জ্ঞানী অধ্যাপক, তিনি মৌলিক চিন্তার অধিকারী। নরেন তাঁর অনুরাগী। সে মাধববাবুর কাছে মোটা মোটা বই চেয়ে নিয়ে পড়ে। কিন্তু পাঠকের কাছে মোটেই পরিস্ফুট হয় না কি বিষয়ে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করে, তাঁর মৌলিক চিন্তার লক্ষ্য কি এবং কেন নরেন মাধব-বাবুর এত অনুরাগী।

কিন্তু তবু নরেন জিজ্ঞাসু মধ্যবিত্ত যুবক, যার অনেক মধ্যবিত্তসুলভ মোহ নেই এবং যার শ্রমে শ্রদ্ধা আছে। ছবিরানী সংগ্রামশীল কর্মিনী মেয়ে, একালীন নায়িকা। 'হলুদ নদী সবুজ বন' উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়ে গেছেন নতুন মানুষদের মর্মের সংবাদ। সেখানে শ্রেণীসংঘাত আছে, আরো আছে: "শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভাগ হয়ে হয়েও একত্র সংগঠিত সমগ্র সমাজের কথা।"

দুই

'হলুদ নদী সবুজ বন' সুন্দরবনের গল্প। সেখানে বহু মানুষ, পুরুষ ও নারী, হিন্দু ও মুসলমান জীবিকার সূত্রে জীবনযাপনের দায়ে মিলেছে। বিদেশী টিম্বার কোম্পানীর কর্তৃপক্ষস্থানীয় জনসন, রবার্টসন, সাদারল্যাণ্ড এবং কারখানার ইঙ্গভাবাপন্ন দেশী কর্ণধার প্রভাস; তাদের অন্তঃপুরে আছেন স্ত্রী, বোন, শ্যালিকা। এইভাবেই মিনার্ভা, আইভি, বনানী, মিসেস বাগচীকে নিয়ে একটি অভিজাত নারীচক্র গড়ে উঠেছে। তাঁরা ক্লাবে, পিকনিকেও উপস্থিত। অন্যদিকে আছে কৃষক, মাঝি, ঘরামি, মজুর, শিকারী প্রভৃতি

ধরিত্রীর সন্তান—নিরঞ্জন, ভূতনাথ, আজিজ, মণ্টু, ঘনরাম, শান সায়েব এবং ঈশ্বর। এই ঈশ্বরই মানিক-কথাশিল্পের জগতে অন্যতম নতুন মানুষ। সে কুবের, ধনঞ্জয়, পীতাম্বর, যাদব থেকে স্বতন্ত্র। গল্পের ঘটনাকাল তিরিশের পরবর্তী সময়; স্থান অত্যন্ত বিঘ্ন-সঙ্কুল: "হলুদ কাদায় ঘোলা নোনা জলের নদী। হাঙর কুমীর আর নানা জাতীয় মাছে ভরা। ডাঙার বন বাঘ ভালুক হায়েনা শেয়াল থেকে নিরীহ হরিণ এবং নানাজাতীয় সরীসৃপ জোঁক বিছা আর পোকামাকড়ে ভরা। সংখ্যার হিসেবে স্বজনতান্ত্রিক মশারাই অতুলনীয়—হিংসার হিসাবেও বটে। নদীর হাঙর কুমীর আর বনের বাঘ ভালুক সাপেরা বছরে যত মানুষের প্রাণ নেয়, মশারা দলে দলে হুল ফুটিয়ে তার চেয়ে কত গুণ বেশি মানুষকে যে আখেরে ঘায়েল করে।" ঈশ্বর বাগ্দী চাষার ছেলে, কিন্তু এখন জমি নেই, বাবার পুরনো-কেনা গাদা বন্দুক দিয়ে সে শিকার করে। ঈশ্বর অব্যর্থ শিকারী। উপন্যাসের যখন যবনিকা উন্মোচন হলো, তখন একটি বাঘ লক্ষ্মণের গরু এবং আরো অনেকের প্রাণ নিয়েছে। সেই বাঘ শিকারে উৎসাহী হলেন বর্ণসঙ্কর প্রভাস এবং খাঁটি সাহেব রবার্টসন। সাথী রইল দেশী শিকারী ঈশ্বর।

প্রভাস ও রবার্টসনের গুলি ব্যর্থ হলে ঈশ্বরের বন্দুকেই বাঘ ধরাশায়ী হলো। বাঘ নয়, বাঘিনী। খবর রাষ্ট্র হতে বাঘ-মারার বাহাদুরি প্রভাস ও রবার্টসন দুজনেই নিতে চায়। সংবাদপত্রের প্রতিনিধি জানতে চান, কার গুলিতে বাঘ মরেছে। মৃত বাঘের পাশে তার ছবিও প্রকাশিত হবে। বাহাদুরি থেকে বচসা, বচসা থেকে হাতাহাতি। প্রভাস ও রবার্টসন দুজনেই সুরাপানে তখন অপ্রকৃতিস্থ। অসাধু পথ নেয় ঈশ্বর। তার বিবেকে বাধে, অনুশোচনা হয়, তবু সে মিথ্যা সনদে সই করে। কারণ তার স্ত্রী গৌরী অন্তঃসত্ত্বা, অসুস্থ এবং তার বাঁচার সম্ভাবনা ক্ষীণ। প্রভাস ও রবার্টসন দুই পক্ষের টাকা নিয়ে দুজনকেই লিখে দেয়, বাঘ তার গুলিতে মরেছে। ছলনার আশ্রয়ে টাকা উপার্জন করে গৌরীকে হাসপাতালে দিয়ে সে যাত্রা মৃত্যুকে ঠেকাল। 'তিন পুরুষের চাষা' ঈশ্বর শেষ রক্ষা করতে পারে নি, ভুলের মাশুল দিয়েছে কঠিনতম। চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়েছে, রবার্টসনের প্রতিশোধ। ঘর পুড়েছে প্রভাসের রোষাগ্নিতে। গোয়াল ঘরে আশ্রয় নিতে হলো সদ্যপ্রসূতি গৌরীকে। প্রহারও কম হয় নি ভাড়াটে গুণ্ডাদের হাতে।

ছাঁটাই ব্যাপারে প্রতিবেশী মণ্টা, আজিজ, নন্দ অবাক হয়েছিল খুবই। ঈশ্বর এজন্যে ধর্মঘট করতে চায় নি। স্পষ্টই বলেছে: "আমার ছাঁটাইয়ের মধ্যে অন্য ব্যাপার আছে।" গ্রাম্য মানুষ, সংসারকর্তব্যের দায়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে, বিবেকদংশনে জর্জরিত হয়েছে এবং নির্মম কঠোর শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছে। তারপর প্রকৃতির দুর্যোগ। সেবার প্রবল বন্যায় হলুদ নদী উত্তাল হয়ে সবুজবন এলাকার বহু ক্ষেত ভাসিয়ে নিয়ে গেল। লেখকের কথায়: "অনাবৃষ্টিতে মরে গেল বেশির ভাগ ফসল। যারা পারলো তারা আবার চাষ করলো, যারা পারলো না তারা কেবল চাপড়ালো। তারপর অতিবৃষ্টির বন্যায় সে ফসলও গেল পচে। ঈশ্বর কোন কারখানায় কাজ পায় নি।" অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। কিন্তু ঈশ্বরের বর্তমান বিপর্যয়ের পটভূমির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হয়েছে। তার কারখানার কাজ নেই এবং সারা পল্লী দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ায় কবলিত। হয়ত সেজন্যেই আর কোনো শাস্তি পায় নি ঈশ্বর।

প্রতিবেশী ঘনরাম, আজিজ, মণ্টা, নকুল, গাড়ি বোঝাই করে বাঁশ খড় নিয়ে এসে ঈশ্বরের ঘর ছেয়ে দেয়। সকলের আলোচনায় ঠিক হয়, ঈশ্বর "বজ্জাতি করে নি, বোকামিই করেছে। হাড়ে মজ্জায়, চোদ্দ পুরুষের চাষা তো!" কিন্তু এ কী গুণ্ডা আইন, গরীবের ঘর পুড়িয়ে দেবে। আজ ঈশ্বরের গৃহদাহ, কাল আজিজ, মণ্টারও হতে পারে। তাই ঈশ্বরকে ঐ অপরাধে বাদ দিলে চলবে না। সবারই প্রতিরোধ চাই। ঈশ্বর প্রথমে বিমূঢ় হয়, পরে সবার জন্য তামাকের জোগাড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

অনেকে সমব্যথী হলে অতিবড় দুঃখেও সান্ত্বনা, স্বস্তি থাকে। তাই শান সায়েব সেদিন ভাইপো রোস্তমের কাছে ঈশ্বরের অবস্থা শুনে প্রচুর সিন্নী পাঠিয়ে দিয়েছে, কেবল পীরের প্রসাদ বলে নয়। শান সায়েব হলুদ নদীর খেয়াঘাট জমা নিয়েছে। সেই খেয়াঘাট তদারকি এবং পয়সা আদায়ের কাজ পেল ঈশ্বর। কাঁচা পয়সা প্রচুর, অথচ সে কোনোদিন বেইমানি করে নি। এইভাবে সুখে চলে যেতে পারত। কিন্তু ব্যবসায়ীরা খেয়াঘাটে স্টীমার চালাবেন। সুতরাং শান সায়েবের চাকরি ছেড়ে ঈশ্বরকে নিতে হলো প্রহরীর কাজ। প্রভাসের বাড়ির সদররক্ষী হবে ঈশ্বর। কারণ এ অঞ্চলে ঈশ্বরের মতো অব্যর্থসন্ধানী নেই এবং ইতোমধ্যে প্রভাস ও রবার্টসনের অন্তঃসংঘাত চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। শিকারী কিংবা চাষীর পক্ষে এই অকর্মণ্যের কাজ

অপমানজনক। তাই ঈশ্বর আক্ষেপ করেছে। কিন্তু জীবনের দায় জীবিকার দাবিতে আক্ষেপই চূড়ান্ত নয়।

প্রভাসের জন্মদিনের উৎসবে পানোন্মত্ততা মাত্রাতিরিক্ত হলে বনানী সর্বনাশ আশঙ্কা করে ঈশ্বরকে ছুটি দিয়ে দেয়। বহুদিন পরে ঈশ্বর শান্তিতে নিজের ঘরে ঘুমোয়। কিন্তু দরিদ্রের সবই প্রতিকূল। বেড়ার দেওয়ালে সিঁদ কেটে তার শিশুপুত্রকে নিয়ে গেল শেয়ালে। বন্দুক সত্ত্বেও ঈশ্বর কত অসহায়।

আবার ভাড়াটে শিকারী হিসেবে ডাক পড়ল ঈশ্বরের। নতুন একটা বড়-মিঞা উৎপাত সুরু করেছে। মানুষখেকো বাঘ। পুত্রশোক তুচ্ছ করে প্রভাসের সঙ্গী হলো ঈশ্বর। বাঘ মরল ঈশ্বরের গুলিতে। সেই বন্দুক হাতে নিয়ে প্রভাস নিজেই শিকারীর গৌরব পেলেন। ঈশ্বরের মনে "আরেকটা কার্তুজ, খরচ করে প্রভাসের মর্মস্থানে গুলি করতেও ইচ্ছা হয়।" বন্দুক, কার্তুজ ফেরৎ দিয়ে ঈশ্বর ভাবে: "কী এমন কম জোরের লাথিটা সে খেলো?" চাকর মেঘনাদ পেয়েছে পদাঘাত, শিকারী ঈশ্বর পেয়েছে অপমান।

শিকারের স্মরণোৎসবে প্রচুর লোক খাওয়ানো হলো। লেখক জানিয়েছেন, উৎসবের সবটুকু অমিশ্র আনন্দ নয়। এই ভোজনপর্বে গুণধর বাগচীর গোপন গুদামে সঞ্চিত সাতশ মণ গম আর সাতাশী মণ আটা পচে যাচ্ছিল, তার আংশিক সদ্গতি হলো।

মর্জির দাম, মানুষের দাম নেই। তাই প্রভাসের মর্জিতে মেঘনাদ এবং ঈশ্বরের কাজ গেল। কিন্তু সে যেন দাবার বোড়ে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কখনো রবার্টসনের, কখনো প্রভাসের চালনায় চলে। প্রভাসের দারোয়ান-পদের দ্বিগুণ বেতনে রবার্টসন তাকে কারখানার প্রহরী নিযুক্ত করে। ফ্যাক্টরীতে ধর্মঘটের সম্ভাবনা। ছোটখাট সংঘর্ষও অসম্ভব নয়। আজিজ, মণ্টা, নকুলের কথায় সব পরিষ্কার বোঝা গেল। তাই কাজ পেয়েও ঈশ্বর চিন্তিত: "এ চাকরী কতদিন?" অন্যরা রসিকতা করে: "তোমার মত শিকারীর বন্দুকে মরাও সৌভাগ্য।" কারণ সবাই জানে, ঈশ্বর অমানুষ নয়; ঈশ্বর জানে, সে আবার বেকার হবে।

তিন

ইতোমধ্যে বড়লোকের খেয়ালে একদিন বনভোজন হলো। সেখানে মিসেস বাগচী, আইভি, বনানী ইত্যাদি পরস্পর আভিজাত্য ও ফ্যাশনের প্রতিযোগিতায় মত্ত, পুরুষেরা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির গুণগানে পঞ্চমুখ। ঈশ্বরের ব্যাখ্যায় একমাত্র বনানীর আগ্রহ তার সহজ স্বরূপের পরিচয়।

'হলুদ নদী সবুজ বন'-এর প্রধান দুর্বলতা লখার মার চরিত্র। সে কথকতা করে। পৌরাণিক কথকতা। পরে রোস্তমের রচনায় সে 'হলুদ নদী সবুজ বন' অঞ্চলের নতুন পরিবর্তন, নতুন চেতনার কথা ব্যাখ্যা করে। পৌরাণিক রূপকে একালের কাহিনী। এক যে ছিল অরণ্যকন্যা, রাজকন্যারই মতো, তার রূপ ঐশ্বর্য। তাতে মুগ্ধ হয়ে এলো কৃষক, মজুর। দুজনের ভালোবাসায় অরণ্যকন্যা দ্বিধাগ্রস্ত। রূপক ভেদ করে চাষী মজুরের সংগ্রাম, সুখ দুঃখের কাহিনী ব্যক্ত হয়।

ঈশ্বরের স্ত্রী গৌরীর সমব্যথী এবং ঈশ্বরের অনুরাগিনীরূপে উপন্যাসে তার ভূমিকা প্রয়োজনীয়, কিন্তু উপন্যাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ থেকে লখার মার সুবিস্তৃত কাহিনী যেন শিথিলসংলগ্ন মনে হয়। ঈশ্বর ও লখার মার মধ্যে পরস্পরের প্রতি দুর্বলতাটুকু অস্বাস্থ্যকর নয়। কিন্তু প্রেমালাপের জন্য নুরুল-আজিজ, রোস্তম-ফুলজান এবং লখার মা ও ঈশ্বরের দলবেঁধে একত্র বনবিহার অপরিহার্য ছিল না।

সুন্দরবনের বর্ষা যেমন সর্বনাশা, তেমনি ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া। বোনের বিয়েতে গৌরী গেল বাপের বাড়ি। তখন ঈশ্বর অসুস্থ। তারপর অসুখের বৃদ্ধি। ম্যালেরিয়া জর। দুদিনেই ফিরে এলো গৌরী। এদিকে তখন বর্ষার জল নদী ফাঁপিয়ে ডাঙায় উঠেছে। অনেকে ভাঙনে মরেছে। নদেরচাঁদের বৌ পথ চলতে চলতে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, তিনবার হাত কপালে ঠেকায়। তারপরেই হলুদ স্রোতে নিশ্চিহ্ন। জরে বেহুঁস ঈশ্বরকে গৌরী আর পিসী কোনোমতে চৌকির ওপর তুলে ধরে। কিন্তু কতক্ষণ পারা যায়, মৃত্যু আসন্ন। ঘরের চালা পড়ে গেছে। তবু মানুষ বাঁচে। তাই শান সায়েবের নৌকা নিয়ে আসে রোস্তম, আসে বনানীর পাঠানো নৌকা। উপসংহারটি সংকেতভাষী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই উপযুক্ত: "কোথা নিয়ে যাবে?

যেখানে উঁচু জমি আছে, যেখানে ঘরবাড়ী খাড়া আছে।…পায়ের নিচের

মাটি তো সরে যায় নি। আয় সবাই মিলে ধরাধরি করে মানুষটাকে (ঈশ্বরকে) নৌকায় নামিয়ে আনি। মানুষের আশ্রয় মিলবেই, বন্যা হোক, আর ভূমিকম্প হোক।"

চার

ষোড়শ পরিচ্ছেদে মানিকবাবু বিবৃতি দিয়েছেন :

"নানা স্তরের নানা জাতের এতগুলি মানুষকে নিয়ে বন নদী গ্রাম এবং গ্রামকেন্দ্রিক স্বয়ংস্ফূর্ত শিল্প কেন্দ্র নিয়ে আমাদের এই সচলায়তনের কাহিনী ফাঁদা হয়েছিল। এতদূর এগিয়ে দেখা যাচ্ছে, ব্যাপার বড় গুরুতর।

মানুষকে বাদ দেবার প্রশ্নই অবশ্য ওঠে না। সব গল্পই মানুষের কাহিনী, পুরাণে দেবতারা যতই জাঁকিয়ে বসে থাকুন। মানুষ ছাড়া দেবতারও গতি নেই। কিন্তু একটা অঞ্চল? একটা বিশেষ এলাকা? হলুদ নদী সবুজ বন, গ্রাম আর একটা শিল্পকেন্দ্রকে বাদ দিলে সঙ্গে সঙ্গে এতগুলি মানুষ একেবারে বাতিল নিশ্চিহ্ন অর্থহীন হয়ে যায়।"

বলাবাহুল্য, উপন্যাসের অঙ্গে এ-বিবৃতি বহিরারোপিত, ভূমিকা বা পরিশিষ্ট রূপে তা যোজিত হতে পারত। তবু এই বিবৃতি থেকেই উপন্যাসের উদ্দেশ্য প্রস্ফুট হয়েছে। লেখক হলুদ নদীর ধারে সবুজবনে যারা চাষ করে, মাছ ধরে এবং মজুর খেটে জীবননির্বাহ করে, তাদের কাহিনী বলতে বসেছেন। মানুষগুলিকে সুখ, দুঃখ, বেদনা, স্বপ্নে জীবন্তরূপে ফোটাতে হলে পরিবেশকেও প্রাধান্য দিতে হয়। পদ্মানদীর মাঝিদের চরিত্র প্রস্ফুটনে পদ্মার প্রভাব সবচেয়ে বেশি। লেখক সেদিকে যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। 'হলুদ নদী সবুজ বন'-এও নদী ও বনের সঙ্গে মানুষগুলির জীবন শৈশব থেকে জড়িয়ে গেছে। এখানেই এদের পরিশ্রম, আনন্দ, দুঃখ, অপঘাত মৃত্যু—এই নিয়ে জীবনসংগ্রাম। অভিপ্রায় ছিল চরিত্রপ্রাধান্য রক্ষার, কিন্তু রচনার মধ্যপথে দেখা গেল, চরিত্রগুলির স্বাভাবিক গতিবিধির জন্যই আঞ্চলিক পরিবেশের প্রাধান্য চাই। তাই ষোড়শ অধ্যায়ের পরে কল্পিত হয়েছে স্কুলের শৌখীন বনবিহার। লেখক সুঁদরি, পশর, অর্জুন, গরাণ প্রভৃতির পরিচয় দিয়েছেন। গুলোর বাধা আরণ্যক ঈশ্বরের কাছে বাধাই নয়।

আর-একবার উপন্যাস সম্পর্কে লেখকের কৈফিয়ৎ আছে : "একবার লিখছি ঈশ্বর গৌরী আজিজ শান নায়েব ফুলজান মণ্টা সাধুদের কাহিনী, আবার আসছি প্রভাস বনানী ইভা রবার্টসনদের কথায়।...একেই কি বলে প্যারালাল মানে সমান্তরাল কাহিনী! বুদ্ধি খাটিয়ে চালাকি করে উচ্চমধ্য এবং নিম্ন অর্থাৎ চাষীমজুরদের হাজির করে ছককাটা গল্প রচনা করা?

এতকাল সাহিত্যচর্চা করে তাহলে আমার কাণ্ডজ্ঞান নিশ্চয়ই লোপ পেয়েছে বলতে হবে। শ্রেণীবিভক্ত জীবন কোন দেশে কস্মিনকালে প্যারালাল ছিল না, এখনও নেই, সোনার পাথর বাটির মতই সেটা অসম্ভব ব্যাপার।" (চতুর্দশ অধ্যায়)। প্যারালাল কাহিনী আছে কিনা এবং উচ্চ-মধ্য ও নিম্ন—তিনশ্রেণীর নরনারীর জীবনালেখ্য অঙ্কনে 'হলুদ নদী সবুজ বন'-এর সাহিত্য মূল্য খর্ব হয়েছে কি না—বিচারের দায় পাঠকের, সমালোচকের। লেখক যে কাহিনীবিন্যাসের সময় কত সচেতন থাকেন, এই কৈফিয়তে সেটুকু বোঝা যায়। 'সমুদ্রের স্বাদ', 'তেইশ বছর আগে ও পরে', 'শহরবাসের ইতিকথা' প্রভৃতি গ্রন্থে লেখকের গ্রন্থ-পরিচায়ক ভূমিকা আছে। তিনি উপন্যাসে ভূমিকার বিরোধী ছিলেন, অথচ লিখেছেন। উপন্যাসের বক্তব্য চরিত্রমাধ্যমে উপস্থিত করেও লেখক স্বস্তি পান নি; গ্রন্থপাঠের প্রস্তুতিরূপে ভূমিকায় পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 'হলুদ নদী সবুজ বন'-এ ভূমিকা নেই, কিন্তু উপন্যাসের দুটি অধ্যায়ে লেখকের বক্তব্য প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। সাধুসন্তদের জীবনী বা আত্মস্মৃতি রচনার ধাত তাঁর ছিল না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বাঙলা কথাশিল্পে নিয়ত নিরীক্ষার শিল্পী। এই প্রাসঙ্গিক বিবৃতি-গুলিতেই তাঁর শিল্পীমানসের ক্রমপরিবর্তমানতার সামান্য ইঙ্গিত রয়ে গেল। 'হলুদ নদী সবুজ বন'-এ উচ্চকোটির প্রভাস, রবার্টসন; মধ্যবিত্ত সুখেন্দু এবং শ্রমিক ঈশ্বর, আজিজ, মণ্টার জীবনে পার্থক্য প্রচুর, কিন্তু একটাই জীবন, কেউ কারও থেকে অসম্পৃক্ত নয়। এই উপলব্ধি নিঃসন্দেহে গোত্রান্তরিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগ্রসর চেতনার পরিচায়ক। "ঈশ্বর আজিজরা থাকে একস্তরে, প্রভাস রবার্টসনেরা আরেক স্তরে। তাই বলে জীবন কি তাদের সম্পর্কহীন? পরস্পরকে বাদ দিয়ে তাদের কারো জীবনযাত্রা সম্ভব? সম্পর্ক কি শুধু প্রেমে হয়! সংঘাত সম্পর্ক নয়?" যেন লেখকের স্বগতচিন্তা উপন্যাসে বিধৃত হয়ে পড়েছে। প্রশ্নাকার বাক্যগুলির মধ্যেই প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে। প্রেম-প্রীতি সত্য, সংঘাত সত্য, তবু জীবনের ধারা অখণ্ড।

পাঁচ

নতুন নায়ক ঈশ্বর ভূমিহীন কৃষাণ, বর্তমানে মজুর। মজুর নায়ক মধ্যবিত্ত নায়কের মতো একক, স্বতন্ত্র নয়। তাই নগেন্দ্রনাথ বা মহিমের মতো স্ব-প্রধান মনোলোক বিশ্লেষণের নীতি এখানে মানিকবাবু গ্রহণ করেন নি। আজিজ, মণ্টু ইত্যাদিকে নিয়েই শ্রমিকদের সংহত সমাজ। একের দুঃখে অপরের সহযোগিতা, পরস্পরকে ভুল না বোঝা অগ্রসর শ্রমিকচেতনার পরিচায়ক। এই উপন্যাসে মানিকবাবু তাকেই রূপায়িত করেছেন। সেজন্যেই প্রশ্ন জাগে, এতগুলি পরিণতবুদ্ধি শ্রমিক থাকা সত্ত্বেও কারখানার অসন্তোষ শেষপর্যন্ত কেন ধূমায়িত বিক্ষোভের স্তরে রয়ে গেল? ঈশ্বর কারখানা গেটের প্রহরী মাত্র থাকায় উপন্যাসে নতুন নায়কের আবির্ভাব স্বীকৃতি মাত্র পেল, কিন্তু পরিণতি খণ্ডিত হলো। অথচ ধর্মঘটের পটভূমিতে উচ্চকোটির সঙ্গে নিম্নকোটির 'সংঘাত' ভালো ফুটত, ঈশ্বরের বাহুবল কেবল পশু-শিকারে এবং মনোবল নির্ভীকতায় মাত্র প্রতিফলিত না হয়ে আরো বাস্তবভাবে প্রকাশিত হতে পারত। ঈশ্বরের সারল্য, বন্য বলিষ্ঠতা, সহজাত নীতি, বিবেকবোধ যতটা আছে; ততটা নেই সংগ্রামের পরিচয়। তবু ঈশ্বর কুবের, ধনঞ্জয় নয়; মনোভাবে, চিন্তায় সে অনেক আধুনিক। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কর্মী ঈশ্বর ভাবুক হয়ে পড়েছে: "মা ছাড়া জীব বা জীবন সম্ভব নয়। কিন্তু আরেকটা দিকও তো আছে। ভ্রূণহত্যা হচ্ছে না সংসারে? সন্তানকে মরণের মুখে তুলে দিয়েও ফূর্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে না অনেক মা? অন্ধ মায়ার বিকারে অনেক সন্তানকে মেরে ফেলছে না? (আজকাল একটু ভাবতে শুরু করেছে বলেই কি এসব ভাবনা তার মগজে সহ্য হয়!)" মাতৃত্ব সম্পর্কে দরিদ্র ও অভিজাত নারীর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। লেখকের শ্রেণীচেতনা যেন নায়কচরিত্রে আরোপিত হয়েছে, আখ্যানধারার অনিবার্য ঘটনাপরম্পরায় এই চেতনা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে নি।

ছয়

'ইতিকথার পরের কথা' 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত, 'শহর-বাসের ইতিকথা'র পরবর্তী কাহিনী বললে অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু আসলে স্বতন্ত্র কাহিনী। ক্ষীয়মান বারতলার জমিদার পরিবারের একমাত্র সন্তান শুভময়। সে উচ্চশিক্ষিত, স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাবে ভারতে স্বাধীন

শিল্প নির্মাণের স্বপ্নে তন্ময়। গ্রামের 'নবশিল্প মন্দির' তারই সাক্ষ্য। কিন্তু বৃহত্তর দেশের অর্থনৈতিক জীবন যখন কোটিপতিদের কবলে রাহুগ্রস্ত, তখন ছোট একটি লণ্ঠনের কারখানা কতটুকু আলোকিত করতে পারে। বিষণ্ণ হতাশ শুভময় অন্তরের বৃহৎ কল্পনার পূরণ করতেই সমুদ্রযাত্রা করল। বিদেশের দুরূহ বিজ্ঞানের পরীক্ষায় প্রভূত সাফল্য অর্জন করে সে দেশে ফিরে এলো। বোম্বাইয়ের বিরাট কাপড়ের কলগুলি দেখে শুভর মনে হয়েছিল: "এদেশে কাপড়ের মিল গড়ার জন্যই তো চরকার আন্দোলন।" শুভময় গতানুগতিক ধারার জমিদারনন্দন নয়। পারিবারিক আভিজাত্যের প্রচ্ছদপট ফেলে দিয়েও সে স্বগ্রাম, স্বদেশ, প্রতিবেশীর কথা চিন্তা করতে পারে। 'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথের সঙ্গে 'ইতিকথার পরের কথা'র শুভময়ের পার্থক্য আছে। শিবনাথের বাবা জমিদারগোষ্ঠীর কলুষমুক্ত ছিলেন—সর্বোপরি লক্ষনীয়, অজ্ঞান বয়সেই শিবনাথ পিতৃহীন হয়েছিল। তাই তার চরিত্রে স্নেহময়ী শৈলজা ও জ্যোতির্ময়ীর প্রভাবই বর্তমান, পিতৃপ্রভাব নেই। শুভময়ের পিতা জগদীশের ঐশ্বর্যরবি অস্তোন্মুখ; তবু প্রজাপীড়ন, মিথ্যা মামলা, পুলিশের সহযোগ সবকিছুতেই তাঁর প্রতাপ অনুভব করা যায়। শিশু শুভময়ের প্রতি পিতৃস্নেহের প্রকাশই কি কম দুঃখজনক হয়েছিল। ভোলা বাগ্দীর আঙুল কাটা যায়, নায়েব কালীচরণের প্রহারে জর্জরিত কৈলাস অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

এহেন শুভময় যৌবনে পিতৃ-পিতামহের অনুগামী হয় নি। শিবনাথ নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্য করতে না পেরে ময়ূরাক্ষীতীরে কৃষিক্ষেত্র বানিয়ে আত্মনির্বাসন বরণ করেছে; শুভময় বহুভ্রান্তি, প্রতিকূলতা, বিরোধকে জয় করে নতুন শিল্পোন্নয়নে অংশীদার হতে চেয়েছে। কিন্তু 'ইতিকথার পরের কথা'র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র শুভময় নয়, কৈলাস দত্ত, শ্যামাসঙ্গীত গায়ক ত্রিভুবন দত্তের পুত্র। কৈলাস কলকাতায় শ্রমিকের কাজ করে, ছুটির দিনে বারতলা যায়। শ্রমিক কৃষক পৃথক নয়, গ্রামের কৃষাণ বোঝে না শহরের শ্রমিকের সংগ্রাম, শ্রমিকও জানে না কৃষকের সমস্যা। কৈলাস প্রাক্তন কৃষাণ, বর্তমানে শ্রমিক; এবং কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যে যোগসূত্র।

যুদ্ধফেরৎ খোঁড়া গজেনের মেয়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে কৈলাসের যোগাযোগ দীর্ঘকালের, কিন্তু একের সঙ্গে অন্যের কী গভীর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, তা সহজে বোঝা যায় না। নানা সুখ দুঃখের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সেই সম্পর্ক উপলব্ধি

করতে হয়। ইতোমধ্যে অন্যগ্রামে লক্ষ্মীর বিবাহ হওয়ায় তাদের সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটে। সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে লক্ষ্মীছাড়া মানুষটাকে গৃহমুখী করার বাসনা নিয়েই দূর সম্পর্কীয় বোনের সঙ্গে লক্ষ্মী কৈলাসের বিবাহ দেয়। তারপর লক্ষ্মী ফিরে আসে বাপের বাড়ি, কৈলাসের স্ত্রী দশদিন পর সাপের কামড়ে মারা যায়।

'হলুদ নদী সবুজ বন'-এর ঈশ্বর ও লখার মার প্রেম এবং কৈলাস-লক্ষ্মীর প্রেম তুলনীয়, অথচ সর্বথাতুল্য নয়। দুটিই অবৈধ প্রণয়ের নিদর্শন, দুটি ক্ষেত্রেই প্রণয়ের ভিত্তি গভীর সহমর্মিতা। লক্ষ্মী ও লখার মা "দুজনেই ঘা-খাওয়া পোড়-খাওয়া ঘাগী মানুষ সংসারের।" বাইরের জৌলুসে এই প্রণয় আলোকিত নয়। ঈশ্বরকে ভালোবেসেই লখার মা গৌরীর শোকমোচনে ব্রতী হয়, গৌরীকে সন্দেহ-বিষবাষ্প থেকে দূরে রাখবে বলেই দীর্ঘদিন সে ঈশ্বরের কুটিরের পথ মাড়ায় নি। আবার বন্যা-বৃষ্টির দুর্দিনে আসন্ন মরণের হাত থেকে সেই ঈশ্বরকে বাঁচাতে অগ্রণী হয়েছিল। 'ইতিকথার পরের কথা'য় পরিস্থিতি ভিন্নতর। কৈলাস দায়মুক্ত, লক্ষ্মীরও স্বামীগৃহের স্মৃতি মধুর নয়। কৈলাস বাদাবনের শ্রমিকের চেয়ে অনেক পরিণত রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন, লক্ষ্মীও কথকতাকরা মেয়ে নয়। নির্যাতিত প্রবীণ দেশকর্মী জীবনবাবু বহুদিন পর গ্রামে ফিরে অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় সকলে লোচনের বাড়িতে জড়ো হয়ে যখন তার সেবা শুশ্রূষা করল, তখন লক্ষ্মীও ছিল। গভীর রাতে সে বাড়ি ফেরে। সুতরাং কৃষকের ঘরের মেয়ে হলেও লক্ষ্মী যথেষ্ট সপ্রতিভ মেয়ে। যুদ্ধের পর বলেই এমন সপ্রতিভতা সম্ভব। পুলিশের ব্যাটনের দাগ তার কপালে, আজো মাঝে মাঝে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। "যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ সৈন্য পুলিশ দাঙ্গা হাঙ্গামা ধানের লড়াই একেবারে ওলটপালট করে দিয়ে গেছে চেতনা।…প্রচণ্ড ঘটনার আধুনিক ট্র্যাক্টর চষে দিয়ে গেছে অনুভূতির ক্ষেত, এখনো দিয়ে চলেছে।"

কৈলাস-লক্ষ্মীর ব্যক্তিগত জীবনে ব্যর্থতার অভিশাপ, অথচ তারা নৈরাশ্যপীড়িত নয়, জীবনসংগ্রামে ক্লান্ত নয়। শুভময়ের ক্ষুদ্র শিল্পগঠনের উদ্যোগ যখন রূপায়িত হলো বাসন তৈরির কারখানায়, তখন লক্ষ্মী হলো তার সহায়িকা। চাকুরিপ্রার্থী হয়ে সে আসে নি, শুভময়ই উপযাচক হয়ে তার পরামর্শ চেয়েছে। কৃষকবধূদের মধ্যে আধুনিক সংগ্রামের বার্তা ছড়িয়ে দেয় লক্ষ্মী। কৈলাসও কৃষকসমাজে যথেষ্ট গণ্যমান্য। তার অভিমত, পরামর্শ

নন্দ ডাক্তারের কথার চেয়েও চাষীদের কাছে বেশি মূল্যবান। শুভময় সম্পর্কে সে প্রথমে সন্দিগ্ধ ছিল। কারণ শুভেচ্ছা বাইরের জিনিস, আর দৈনন্দিন জীবনে ছোট বড় নানা ব্যাপারে পিতৃনিন্দা শোনা বড় কঠিন। পিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো আরো কঠিন। কিন্তু শুভময় পরীক্ষায় অনেকটা উত্তীর্ণ হয়েছে, যার ফল গৃহত্যাগ। জগদীশ তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। শুভময়ও উদ্‌ভ্রান্তের মতো কিছুকাল কলকাতা ঘুরে আবার গ্রামে আশ্রয় নিল। গৃহে নয়, কৃষক-কারিগরদের মধ্যে। যে কোনো বাড়িতেই তখন তার ঠিকানা। শুভময়ের প্রণয়িনী মায়া প্রাণের তাগিদে সর্ব অভিমান ত্যাগ করে তাকে নিতে এসেছে কৃষকপল্লী থেকে। লেখক ইঙ্গিত দিয়েছেন, কৃষক আন্দোলনের সহমর্মী হয়েও শুভময়-মায়ার প্রেমে ভাঙন ধরে নি। প্রকৃত প্রেম মহত্তর। সেখানে লক্ষ্মী, মায়া, বনানী, আইভি ভিন্ন নয়।

শুভময় সামন্ত মনোভাব ধীরে ধীরে ত্যাগ করেছে, কৈলাস নিম্নবিত্ত থেকে কৃষক-মজুরে পরিণত হয়েছে। অর্থনৈতিক দায়ে, রাজনৈতিক চেতনার আলোকে ধনতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী আঘাতে মানুষের মনের শ্রেণীচ্যুতি ঘটছে। 'ইতিকথার পরের কথা'র শুভময়; নন্দ কৈলাস তার সাক্ষী। এখানেও মানিকবাবু দেখিয়েছেন, রিক্ত দরিদ্র মানুষগুলি জেনেছে সংহতির শক্তি কী অমোঘ। ঘনরাম, গজেন, সনাতন, লোচন, কৈলাস, নন্দ সকলে মিলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে।

'ইতিকথার পরের কথা' দ্বিধারা কাহিনী। শুভময়, মায়া, ভূদেব ইত্যাদিকে নিয়ে একটি ধারা; বিলাতী খেতাবধারী ডাক্তার ভূদেবের একমাত্র কন্যা মায়ার সঙ্গে শুভময়ের প্রণয় কাহিনী বহু উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে একটি পরিণতিলাভ করেছে। অন্যধারা হলো বারতলার গ্রামীণ মানুষদের জীবন-গাথা; সেই ধারায় নন্দ ডাক্তারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য, কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র কৈলাস ও লক্ষ্মী। 'হলুদ নদী সবুজবন'-এর মতোই এখানেও আছে প্যারাললিজ্‌ম, এখানেও যেন লেখকের বক্তব্য : "পরস্পরকে বাদ দিয়ে তাদের কারো জীবনযাত্রা সম্ভব? সম্পর্ক কি শুধু প্রেমে হয়! সংঘাত সম্পর্ক নয়?" এ উপন্যাসেও পাই "শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভাগ হয়ে হয়েও একত্র সংগঠিত সমাজের কথা।" তাই কৈলাস, লক্ষ্মী, লোচন, ঘনরাম প্রভৃতি প্রথমে শুভকে সন্দেহ করলেও তার সদিচ্ছাকে, তার প্রগতিশীল মনোভাবকে চিনে নিতে দেরি হয় নি। জগদীশ, জীবনবাবু টাইপ মাত্র; শুভময়ের মতো যুবক একালে

দুর্লভ নয় ; নন্দ, কৈলাস প্রভৃতির জোট তো আধুনিক কৃষক আন্দোলনেরই আলেখ্য। মানিকবাবু আমাদের পরিচিত অভিজ্ঞতাকেই উপন্যাসে গ্রথিত করেছেন। প্রতিবেদকের কাজ শিল্পী নিয়েছেন। তাই প্রতিবেদন অল্প নেই, কিন্তু শিল্পও ক্ষুণ্ন হয় নি। বিশেষত কৈলাস-লক্ষ্মীর মানসিক অবস্থা এবং শুভময়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণে মানিকবাবুর নৈপুণ্য যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচায়ক।

কৈলাস-লক্ষ্মীর মিলনে যখন কোনো বাধা নেই, তখনও লক্ষ্মী ভাবে : "কদিন তারা মেতে থাকতে পারবে ওভাবে পরস্পরকে নিয়ে? কতদিন স্থায়ী হবে তাদের দুর্দান্ত উন্মাদনা? কদিন তাদের শুধু পরস্পরকে নিয়ে মেতে থাকার সুখ?" দুটি পোড়খাওয়া নর-নারীর জীবনে প্রেম এলো, কিন্তু তার প্রকাশ ব্যাহত। লক্ষ্মী ও কৈলাসের আন্তরিক জৈবআবেগ সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি বিবেচনা, সংযম এবং সমব্যথী সকলের জন্য সংগ্রামস্পৃহা তাদের প্রেমকে মহনীয় করেছে। "কৈলাস তার মনুষ্যত্বে বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছে।" সেজন্যেই লক্ষ্মী কৈলাসের সর্বতোভাবে কল্যাণ চায়।[১] সে তুলনায় মায়ার প্রেমের ভাষা একটু অশ্লীলই মনে হয় : "খিদে পেয়েছে খাবার রেডি, তুমি উপোস করছ কেন সেটা বরং বুঝিয়ে বল। আমিও খিদে নিয়ে উপোস করে চলেছি মনে রেখো কিন্তু।" রূপকের একটা আবরণ আছে বটে, কিন্তু সেখানেও খাদ্য-খাদকের সম্বন্ধ!

সাত

অতি সাবধানী লেখকের কলম থেকে উপরি-লিখিত বই দুটিতে একই ধরনের ত্রুটি নিঃসন্দেহে তাঁর প্রতিভার পক্ষে গৌরবজনক নয়। মানিকবাবু অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লিখতেন। বলা বাহুল্য, বিশ্লেষপ্রাণ কথাশিল্পে বাগর্থ অপৃথগ্ যত্ন নির্বত্য হয়ে থাকে না ; তার জন্য সুস্থির অনুশীলন চাই। তবেই মনে হবে যেন বাক্য ও ঈপ্সিত অর্থ এক প্রযত্নে সিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু মানিকবাবু সে অবকাশ পান নি। তাই মানিকবাবু প্রচণ্ড শক্তিধর প্রতিভা, কিন্তু পূর্ণতার বৃত্তে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি। তুলনীয় কাজী নজরুল ইসলাম। তিনিও অত্যন্ত ক্ষিপ্রহস্ত, উচ্চকণ্ঠ কবি। তাঁর কবিতা হাতে

---

১ লেখকের ব্যাখ্যা : 'কৈলাস আর লক্ষ্মীর মাঝখানে দুস্তর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, মানুষের মনের যুগ যুগান্তরের সংস্কার আর কুসংস্কারের স্তূপ, জনতাকে না ডিঙিয়ে তাদের মিলনের উপায় নেই।' এই ব্যাখ্যা গ্রন্থমধ্যে অপরিহার্য ছিল না।

নিয়ে ওয়ার্ডস্বার্থের সংজ্ঞাকে সর্বথা প্রযোজ্য মনে হয় না। আবেগের নির্জন স্মৃতিচর্বণাই কবিতার উৎস ("Poetry takes its origin from emotion recollected in tranquility") হলে নজরুল ইসলাম কবি নন। আগ্নেয়গিরিকে বলা যায় না, তুমি স্থির হও, স্নিগ্ধ হও, কান্ত হও। নজরুলের কবিতা যেমন ক্রোধ, ক্ষোভ, ঘৃণার অগ্নিস্রাবী বাণীরূপ ; মানিকবাবুর কথাশিল্পও সাধারণ মানুষের স্বপক্ষে বক্তব্যের তীব্রতা নিয়ে উপস্থিত। সেই বক্তব্য সর্বদা শান্ত, কান্ত হলে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে ব্যবধান হ্রস্ব হয়ে আসে। তবু কয়েকটি ত্রুটি উপন্যাসের প্রকরণকেই দুর্বল করেছে, সুতরাং বক্তব্যের গভীরসঞ্চারী প্রভাব সেখানে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। 'হলুদ নদী সবুজ বন'-এ ঈশ্বরের বারংবার অরণ্যচারণা (উপলক্ষ যতই ভিন্ন হোক) আসলে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি, তাই শেষপর্যন্ত চরিত্র তার প্রাণবেগ হারিয়ে ফেলেছে। 'ইতিকথার পরের কথা'য় কোনো কোনো জায়গা অবান্তর ব্যাখ্যায় ভারাক্রান্ত। শুভময়কে লোকজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দেবার জন্য রুদ্ধদ্বার ডাক্তারখানায় তাকে রেখে বাইরের দাওয়ায় নন্দর কৃষক-বৈঠক চালানোর ব্যবস্থা কিঞ্চিৎ হাস্যকর। গ্রামীণ মানুষের গৃহস্থালীর সমস্যা জানার আগ্রহে লক্ষ্মীর ভূমিকাকে লেখক অহেতুক একটু বেশি মূল্য দিয়েছেন।

'শান্তিলতা' একটি চরিত্রের আশ্রয়ে লেখকের মানস-রূপান্তরের সাক্ষ্য। এখানে লেখকের কল্পনার ভিত্তি একটি উদ্বাস্তু মেয়ে, নাম শান্তিলতা। বৃদ্ধ পিতা চন্দ্রনাথকে নিয়ে সে কলকাতায় এসে বাসা বাঁধল শহরতলীর এক বস্তীতে। চন্দ্রনাথ তখন কাজকর্মে অপারগ, তারপরে আছে বিবাহযোগ্যা মেয়েকে পাত্রস্থ করার দুশ্চিন্তা। তাই সাময়িক উন্মত্ততা তাকে আক্রমণ করল। অবস্থামতো চিকিৎসা হলো, কিন্তু চন্দ্রনাথ হার্টফেল করে মারা গেলেন। এই উপন্যাসটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস নয়, টুকরো টুকরো বাক্যে লেখা উপন্যাসের খসড়া। এর বর্ণনা-বিবৃতি এত কাটা কাটা যে সাবলীলতা ব্যাহত হয়। উপন্যাস-কাহিনীর পরিপূর্ণ কাঠামো অনুধাবন করতে গেলে পাঠককে প্রতিটি বাক্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। "শান্তিলতার রঙ খুব কাল। গড়ন-পিটন আশ্চর্যরকম। খাঁটি ভীল সাঁওতাল মেয়েদের পর্যন্ত যেন হার মানায়।"

চন্দ্রনাথ প্রায়ই চিন্তিত থাকেন। আকাশ-পাতাল চিন্তা। দেশ-বিভাগের পর সুখ-শান্তি-ভালোবাসা, মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে

ধারণাগুলি সব যেন তাঁর গোলমাল হয়ে যায়। একদিনের ঘটনা। দু-তিন
রাত্রির পর চন্দ্রনাথ ফিরে এলেন। উস্কোখুস্কো চুলে, কাদামাখা পায়ে।
মেয়েকে বলেন, "মাঝে মাঝে মনটা কেমন বিশ্রী হয়ে যায় জানিস, সংসারে
কাউকে ভালো লাগে না। চেনা মানুষগুলোকে তো আরও না। তোকেও
না।" চন্দ্রনাথের সাময়িক উন্মত্ততা মানসিক ভারসাম্যহীনতার ফল।
এখানে কোনো উদ্ভট মনস্তাত্ত্বিকতা মানিকবাবুর লক্ষ্য নয়, দৃঢ় বাস্তব ভিত্তির
পরেই তার প্রতিষ্ঠা। চন্দ্রনাথের আত্মভাষণে তার পরিচয় আছে :
"হিসেবে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে শান্তি, কোথাও থই পাচ্ছি না। এতদিন
ধরে যা শিখেছি যা বুঝেছি এই সহরের সঙ্গে দেখি তার কিছুই খাপ খায় না।
একদিন সব কথা তোকে বলব। তোকে ছাড়া আর কাকেই বা বলব?"
কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতার সারবস্তু তিনি আর শান্তিলতাকে বলে যাবার
অবকাশ পান নি।

উপন্যাসে তথা শান্তিলতার জীবনে মোড় ফিরল সুখেন্দুর আবির্ভাবে।
সুখেন্দুও উদ্বাস্তু, ভাগ্য অন্বেষণে শহরতলীতে একটা সাইকেল মেরামতের
দোকান করেছে। পথিমধ্যে চন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তাকে তিনি
নিয়ে এলেন তাঁদের বস্তীতে। "খাঁকি সার্টের সব কটা বোতাম খোলা,
আস্তিন দুটো গুটিয়ে কনুয়ের ওপরে তোলা, পায়জামার কিনার দুটো হাঁটুর
ওপর উঠে এসেছে, পিছনে উলটনো চুলের ছোট ছোট দুটি গুছি ভুরুর ওপর
এসে পড়েছে।" সে চন্দ্রনাথকে সৌভাগ্যের লোভ দেখিয়ে নিজের অজ্ঞাতেই
তাঁকে কুপথে নিয়ে গেল। চন্দ্রনাথ মাঝরাতে মাতাল হয়ে ফিরলেন।

এহেন চন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শান্তিলতা সংসারে একা রইল না। বিমল
তাকে একটি স্কুলে কাজ করে দিল। বিমলকে নিয়ে আর এক উপকাহিনী।
ইঙ্গিতে আভাসে বোঝা যায়, বিমল মার্কসবাদে বিশ্বাসী, সে রাত জেগে
এঙ্গেলসের 'পারিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' পড়ে, বঙ্কিমচন্দ্রের
'আনন্দমঠ'-এর ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অংশ তাকে উদ্দীপিত করে। এই বিমলের
সাহায্যেই শান্তি বাবার চিকিৎসা চালিয়েছে, জেনেছে মানুষ কেন দরিদ্র হয়।
বিমলের সাহায্যে ইস্কুলে শিক্ষকতা পেয়ে শান্তি বস্তী ছেড়ে চলে এসেছে জীবন
মাইতির বাড়ি। সেখানে প্রধান শিক্ষিকা মনোলতার সঙ্গিনী হলো শান্তিলতা।
যেমন শান্তিলতার জীবনের ছক বদলাল তেমন সুখেন্দুও বদলেছে। যে
সুখেন্দু ছিল শান্তির চোখের বিষ, যার দেওয়া দুধের বোতল রাগ করে মাটিতে

ফেলে দিয়েছে, তার প্রতি আর শান্তি নির্মম নয়। মনোলতা ও শান্তির কথোপকথনে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

"—সুখেন্দুকে ভোগাচ্ছিস কেন? তাকে স্পষ্ট করে কিছু বলছিস না কেন?

—আমার কথাতো আমি বলে দিয়েছি। কারবার তুলে দিতে হবে।... ও লোক-ঠকানো কারবার, ওতে বুদ্ধি পচে যায়।

—তুলে দিয়ে খাবে কি?

—কারিগর মানুষ, কারিগর ছিল, আবার কারিগর হতে হবে।...মদ ছাড়বে বলে সকলের সামনে প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

—তোর কথা যদি ও মেনে নেয়?

—তার কথাও আমি মেনে নেব।"

সুখেন্দুর জানা হিসেবে এ-মেয়েকে মাপা যায় না। মেয়ে বলতে সুখেন্দু এতকাল সোজা হিসেবে তার মাকেই বুঝে এসেছে। নীরব, নম্র, বাধ্য। তাই ক্ষোভে, অসন্তোষে যে-মেয়ে অভাবগ্রস্ত হয়েও দুধের বোতল টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে, তার প্রতি একটা কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে! "তার মনে হয় শান্তিলতার রুখে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা যেন অননুকরণীয়।"

সুখেন্দু কেমন করে নতুন হিসেব মিলিয়ে শান্তিলতার মনে স্থান করে নিল সেই কাহিনীটুকু ঔপন্যাসিক মনস্তত্ত্বের দিক থেকে প্রয়োজনীয়। কিন্তু উপন্যাসের বর্তমান আকারে সেই অংশটি একেবারে উহ্য। হয়তো মনোবিকাশের স্বাভাবিক স্তরগুলি জাত-ঔপন্যাসিকের পুনর্লিখনে প্রস্ফুটিত করবার পরিকল্পনা ছিল। পূর্বেই বলেছি—'শান্তিলতা'র লিখিত রূপ উপন্যাসাকার নয়, উপন্যাসের খসড়া মাত্র।

সুখেন্দু ও শান্তিলতার বিবাহরাত্রি বর্ণনা ঔপন্যাসিকের মানসরূপান্তরের পরিচায়ক। মানিকবাবুর কমবেশি ষাটখানি গল্প-উপন্যাসের মধ্যে মধুর মিলনদৃশ্য বিরল। 'শান্তিলতা' উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। লেখক এখানে নরনারীর দাম্পত্যপ্রেমকে তীক্ষ্ণ, তির্যক সমালোচনার শরে ছিন্নভিন্ন করেন নি। বস্তীর নিচু জানলা দিয়েও যেমন আকাশের রোদ আসে; তেমনই দুঃখী, জীবনসংগ্রামে ক্ষয়িত মানুষের জীবনেও মিলনের ফুল ফোটে।

ফুলশয্যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটি সহজ ও সুন্দর। তার পরেই ঘটনার পট-পরিবর্তন। দীর্ঘকালের ব্যবধান অকথিত। শান্তি-সুখেন্দুর আঘাত-

সংঘাতময় জীবনে ঘটনাপরিবর্তন হয়েছে আকস্মিক ভাবে ('প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান'-এ চপলা-মৃদুলা বিবাহও ঘটনাচক্রে এবং আকস্মিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে)। কেবল তাৎপর্যময় মুহূর্তগুলিরই সংক্ষিপ্ত আলেখ্য লেখক লিপিবদ্ধ করেছিলেন পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে ব্যবহারের জন্য।

আর একটি দৃশ্য। শ্রমিক বস্তী বারো ঘর এক উঠোনের সংসার। রাসমণি, লক্ষ্মী, চাঁদি, শান্তি প্রভৃতি সংলগ্ন খুপরির বাসিন্দা। এর ঘর থেকে ওর উঠোন, ওর উঠোন থেকে তার ঘর চোখে পড়ে। সুখেন্দু রাগের বশে শান্তিকে 'আথালি পাথালি' মেরেছে। দড়ি দিয়ে শক্ত করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধেছে। ইচ্ছে করলেই যে কেউ খুলে দিতে পারে, সুখেন্দু বাড়ি নেই। কিন্তু তাতে অত্যাচার বরং বাড়বে, কমবে না। রাগী মানুষ সুখেন্দু। ব্যঙ্গের সুরে হয়তো জানিয়ে দেবে : "শান্তিকে তারা যখন আদর করে নিয়ে গেছে, শান্তি তাদের কাছেই থাকুক।"

তবুও তারা নির্মম হতে পারে নি। শান্তির তৃষ্ণায় সারদা এ্যালুমিনিয়ামের গেলাস ভরে জল এনেছে, রাসমণি তার মুখে দানাদার গুঁজে দিয়েছে। ধীরে ধীরে রাত্রি গভীর হয়, যে যার ঘরে শুয়ে পড়ে। সুখেন্দু তখনও আসে নি। একটু পরেই তার কারণ জানা গেল। তখন কারখানার ভাড়াটে গুণ্ডাদের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে সুখেন্দু অচৈতন্য। "গুণ্ডা হিসাবে রাজারই সামিল" রাজাবাবু সেই বস্তীতে সবারই পরিচিত। কারখানার মালিকের পক্ষ হয়ে শ্রমিক-বিক্ষোভ দমন করাই তার কাজ। "সুখেন্দুকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বিছানায় আছড়ে ফেলে রেখে তারা বেরিয়ে আসে।" রাত গভীর হলেও বস্তীর উৎকর্ণ মানুষ ধীরে ধীরে জানলায়, গলিতে, উঠোনে সমবেত হলো। "কোনো দুঃখের নাটকে সবাই যেন নীরব দর্শক।" শান্তি দাঁত দিয়ে কামড়ে কাটল দড়ির বাঁধন, আলো জেলে দেখল "সুখেন্দুর চোখ টকটকে লাল।" সুখেন্দু দেখল, শান্তিলতার মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। শান্তির ডাকে সকলে কাছে এলো, কিন্তু টিটকারি দিল না! সেবা-শুশ্রূষায় সারা বস্তী একটি একান্নবর্তী পরিবারের মতো নীরবে চঞ্চল হয়ে ওঠে। ডাক্তার আসতেও দেরি হয় না। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর সুখেন্দুর কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত আত্মবিচারণা—"আর তোকে মারব না শান্তি, আর তোকে বাঁধব না।"

কারখানায় একটা গণ্ডগোল বেধেছিল। বড় সাহেবের ফুলবাগান কে মুড়িয়ে খেয়েছে। ছোটসাহেবের কাছে কৈফিয়ৎ চাইলে তিনি বলেছিলেন :

"ফুলগাছ কে মুড়িয়ে দিয়েছে জানি না সার। আমার ডিউটি মেশিনারি কেউ না ড্যামেজ করে দেখা, প্রডাকশন আরও অন্তত হাফ পার্সেণ্ট বাড়াবার জন্য ফ্যাক্টরী আইন মান্য করে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।" কথা সম্পূর্ণ হবার আগেই বড়সাহেব এক চড় দিলেন ছোটসাহেবকে। তারপর কারখানায় গোলযোগ, চুরি ঘোষণা, পাগলা ঘণ্টি এবং ছুটির পরে দেড়ঘণ্টা বাধ্যতামূলক ওভারটাইম। তার প্রতিবাদ করেছিল সুখেন্দু। তারই ফলে সুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরল।

মানিকবাবু কতগুলি তাৎপর্যবহ কিন্তু বিচ্ছিন্ন কাহিনী একত্র গেঁথেছেন। নিছক গল্পরস পরিবেশনের জন্য গল্পের মূল্য তিনি কোনোদিন স্বীকার করেন নি। উদ্বাস্তু চন্দ্রনাথ, শ্রমিক সুখেন্দু, ছোটসাহেব কুমার রায়—সকলেই ধনতন্ত্রের অলাতচক্রে বাঁধা। নিজের অসহায় বিক্ষোভ সুখেন্দু প্রকাশ করে শান্তির ওপরে ; কুমার রায়ের প্রতিহিংসা শ্রমিক-প্রহারে প্রকাশিত। বড়-সাহেবের কাছে ছোটসাহেব এবং ছোটসাহেবের কাছে সুখেন্দু এক। কুমার রায়ের নাম ও পদবী পর্যন্ত বড়সাহেবের খেয়ালখুশিতে বদলে যায়।

আট

শান্তিলতা আর গ্রামবাংলার মেয়ে নয়, সুখেন্দুরও চোখে নেই গ্রাম্য যুবকের স্বপ্ন ; একজন ইস্ট এ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারীং ওয়ার্কসের টার্নার সুখেন্দু দাস, আর একজন তার স্ত্রী। ইয়াকুব আলি কেবল একটি নতুন নাম নয়, এই উপন্যাসে নতুন রক্তের সংযোজন। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতবর্ষে এখন মধ্যবিত্তের দ্বৈধ দশা—এক অংশ সদ্যোত্থিত ধনিকশ্রেণীর পক্ষপুটাশ্রয়ে আভিজাত্যের উচ্চতর সোপানের অভিমুখী। অন্য অংশে যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত, নির্বিত্ত শ্রমিক-সমাজের সঙ্গেই তার আত্মীয়তা। ইয়াকুব আলির সঙ্গে সুখেন্দুর মিতালি সেই নবগঠিত মধ্যবিত্ত-শ্রমিকসমাজের পরিচায়ক। মানিকবাবু শেষ পর্বের উপন্যাসে ও গল্পে মধ্যবিত্তের এই নবপরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন।

কুমার রায়, মা নলিনী ও নিখিলকে নিয়ে মধ্যবিত্তের ওপরে ওঠার কাহিনী। কোম্পানীর পক্ষ থেকে কুমার রায় বিলেত যাবে। একটি এরোপ্লেনের অগ্নিদাহ দেখে নলিনী আপত্তি তুললেন। সেই অগ্নিদাহ দেখেছে সুখেন্দু। শম্ভু মাঝির গোটা চালাঘর পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। তার দুঃখের কথা নিয়ে ভেবেছে সুখেন্দু। নিজের কথাও অনেক তোলপাড় করেছে মনে

মনে। সাথী ইয়াকুবের কথায় সে আত্মবিশ্বাস লাভ করে। "টার্নার স্থখেন্দু।
জড় ধাতুখণ্ডকে ঘষে মেজে গড়ে পেটে—নিরবয়ব পিণ্ড রূপ পায়, আকার
পায়। স্থখেন্দুর মস্তিষ্কের নির্দেশে আর হাতের তাড়নায় বস্তু হয়ে ওঠে, যন্ত্র
হয়ে ওঠে গতির প্রতীক, আর স্থষ্টির সহায় হয়ে ওঠে।" স্থতরাং সেও অন্ন
নয়, তুচ্ছ নয়। এই দৃষ্টিতে শান্তিলতাকেও সে নতুন চোখে দেখেছে।
এতদিনে শান্তিলতার মনের মূল্য দিতে চেয়েছে। "আজ শান্তিলতার মনের
অগাধ ভালোবাসা. অসীম ধৈর্য আর অতল শান্তির উৎসে স্নান করে দিনে
দিনে নতুন হয়ে উঠছে স্থখেন্দু।"

অনেক ভুল বোঝাবুঝির পরে স্থখেন্দু-শান্তিলতার এই প্রকৃত মিলন।
তাই পরদিন সন্ধ্যায় যেন স্থখেন্দুর কাছে নতুন রূপে উদ্ভাসিত হবার জন্যই
শান্তি পরেছে ফুলশয্যার নীলাম্বরীখানা, সযত্নে চুল বেঁধেছে, খোঁপায় দিয়েছে
মালা। পুষ্পর মা পরিয়ে দিয়েছে সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে কুমকুম্ টিপ।
ঠিক এই মুহূর্তে কাহিনীর গতিপরিবর্তন। গর্ব করে শান্তিলতা বলেছিল:
"আমার নাম শান্তি"। কিন্তু শান্তি সে কোনোদিন পায় নি। আর একটি
মাহেন্দ্রলগ্ন যখন প্রত্যাসন্ন, তখনই উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে স্থখেন্দুর সহকর্মী
সহদেব। রাজাবাবুর দলের গুণ্ডামিতে শ্রমিকরা আহত হয়েছে, স্থখেন্দুর
মাথা ফেটে গেছে। সে হাসপাতালে। শান্তিলতা সহদেবের সঙ্গে হাসপাতালে
গেল। এখানেই উপন্যাসের আপাত যবনিকা। বলা বাহুল্য, কাহিনী
এখানে পূর্ণায়ত নয়, শান্তিলতার আরো বিবর্তন সম্ভাবিত ছিল।

'মাঝির ছেলে' একটু স্বতন্ত্র শ্রেণীর রচনা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সাহিত্যিক দ্বিজত্ব এই গ্রন্থের চরিত্র পরিকল্পনায় স্থস্পষ্ট। প্রথম পর্বের শ্রেষ্ঠ
উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি'-র স্থান, অঞ্চল, পাত্রপাত্রী প্রভৃতি উপাদানের নব
রূপান্তর। যেন নিজের হাতে গড়া কাদা-মাটির মূর্তি ভেঙে শিল্পী সেই
উপাদানে আর একবার মূর্তি রচনা করলেন। উপাদান এক, শিল্পমূর্তি
ভিন্ন। হারু মাঝির ভাইপো নাগা এর নায়ক। আটখামার স্টীমারঘাটে
চব্বিশ ঘণ্টায় তিনবার প্রাণ-স্পন্দন জাগে। সকালে, দুপুরে আর সন্ধ্যার
পর। তিনবারই জাহাজ আসে। এই উপন্যাসে করমতলার যাদববাবু
আছেন, একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। মাধববাবু তাঁর ভাই, কলকাতায় থাকেন।
তিনি দেশে আসছেন বলেই যাদববাবুর নৌকো এসেছে আটখামার ঘাটে।
চাঁদ মাঝি দৈবজ্ঞের বাড়ি অসুস্থ হয়ে পড়ায় সে নৌকোয় সাময়িকভাবে নাগা

মাঝির কাজে বহাল হলো। মানিকবাবুর সাহিত্যে কৈশোরচিত্র বিরল। 'পদ্মানদীর মাঝি'তে কৈশোরের ছবি ফোটে নি। কিন্তু নাগা চরিত্রটি আকর্ষণীয়। তার কিশোরস্থলভ দুর্ধর্ষপনা, অভিমান, ভোজনাসক্তি, অল্পে তৃপ্তি লেখক খুব স্থন্দর ব্যক্ত করেছেন। ঘটনা যেমন এসেছে গল্পের অনিবার্য নিয়মে, চরিত্রের সক্রিয়তাও তেমনি ঘটনাকে গতিমণ্ডিত করেছে। অতিরিক্ত সংকেতপ্রবণতা মানিকবাবুর বহু উপন্যাসে চরিত্র-গুলিকে অনেকসময় আদর্শপুত্তলি করেছে। 'মাঝির ছেলে' সেই ত্রুটি থেকে মুক্ত।

এক আনার কলহে খুড়ো হারু মাঝির নৌকো ছেড়ে নাগা যাদববাবুর নৌকোয় কাজ নিল। খাওয়াপরার ব্যবস্থা ভালো, আবার বেতনও আছে। ওবাড়ির ছেলেমেয়ে খোকা, কণিকা, মিনতির সঙ্গেও বেশ আলাপ হয়েছে। সে আছে ভালো, কিন্তু তার মতো প্রকৃতির মানুষ শান্তি, স্বস্তির বাঁধা ছকে চলতে পারে না। নাগা অনেকটা তোরাপের উপাদানে গঠিত। অত্যন্ত বলিষ্ঠ, একান্ত সরল, গ্রাম্য, অল্পে অভিমান হয় এবং গোঁয়ার।

বাগানের আম চুরি যায় শুনে সে প্রতিকারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সারারাত বনে ঝোপে বসে থেকে সে চোরের দল ধরে ফেলেছে। কিন্তু তাদের শাস্তির সময় সে-ই বেঁকে দাঁড়ায়। কারণ সে কথার মানুষ। প্রথমে তার কণ্ঠস্বরে ছিল "মিনতি", কিন্তু ছ্যাঁকা দেওয়া শাস্তির কথায় তার বিনয়ের ভাবটা "হঠাৎ যেন উপে গেল"।

"—বড় যে দরদ দেখিরে নাগা?

—দরদ না কর্তা, কইয়া আনছি আর কেউ মারব না।"

তারপরেই গোয়ালে আগুন লাগার ঘটনা। চোর ধরা এবং শাস্তি দেখার উল্লাসে পরেশ তাড়াতাড়ি গোয়ালঘরে খুন্তি পুড়িয়েছিল। শাস্তি হলো না দেখে মনোভঙ্গের বেদনায় সে আগুন নেভাতে ভুলে গেল। নাগাই প্রথম পোড়া জিনিষের গন্ধ শুঁকে বিপর্যয় টের পেল। আর সকলে যখন হতভম্ব, তখন নাগাই একমাত্র প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। বিপদ-ভঞ্জনে সে সেনাপতির মতো, সকলেই তার নির্দেশে খড়ের পুরনো চালাটি ভেঙে ফেলেছে। এই-প্রসঙ্গে যাদববাবুর চরিত্রও স্থন্দর ফুটেছে। সকলের সামনে নাগার হাতে নিজের আংটি খুলে পরিয়ে দিয়েছেন যাদববাবু। "শো গিয়া।…ঘুম যদি ভাঙ্গায় তর আমারে কইস্।" আংটি বা ঘুমের চেয়ে তখন

নাগার বড় দরকার খাওয়া। "দুগাল মুড়ি খাইয়া যাই কর্তা।" পরেশ ভয়ে অগ্নিদাহের কারণ গোপন করেছে। তবু আশঙ্কা, পাছে নাগা বলে দেয়। "পরেশের ইচ্ছে হয় গলা টিপে ঘুমন্ত ছোঁড়াটাকে মেরে ফেলে আংটিটা নিয়ে পালিয়ে যায়।" ক্ষণকালীন আগুনের আলোয় মানিকবাবু দুটি কিশোরপ্রাণের অকপট বাসনা, বন্য সরলতার ছবি উজ্জ্বল রঙে এঁকেছেন।

মাঝির ছেলে চাঁদ, হারু, নকুল, নাগা এই উপন্যাসের প্রাণবীজ ধারণ করে আছে। তবু যাদববাবু এই মাঝিদের জীবনসূত্রেগ্রথিত কেন্দ্রীয় পুরুষ। আটখামার ঘাটে গিয়ে যাদববাবু পরেশের দু-টাকা জরিমানা করলেন। "তুই একটা আস্ত বাঁদর পরেশ।…এতকাল যে আছিস আমার কাছে, বিনা দোষে শাস্তি দিতে আমায় তুই কবে দেখছস্ রে হারামজাদা? আমার হুকুমে শিক তাতানের লাইগা আগুন ধরাইছিলি দুপুর রাইতে, ঘুমের চোখে আগুন নিভাইতে ভুইলা গেছিলি তো গেছিলি। অমন ভুল মাইনসে করে। যখন জিগাইলাম মিছা কইলি ক্যান?" আবার পরেশের সঙ্গে নাগার কলহ বাধে। পরেশের ধারণা নাগাই সত্য প্রকাশ করেছে। বারবার "গোইন্দা বজ্জাৎ" বলায় নাগা পরেশকে এত কিল চড় লাগিয়েছে যে "এক মিনিটের মধ্যেই পরেশ চোখে সরষের ফুল দেখতে আরম্ভ করে।" ছোট ছোট কয়েকটি ঘটনা, অথচ বাংলা দেশের মাটির কত ঘনিষ্ঠ পরিচয়। পরেশ, নাগা, কণিকা, রূপা চারটি কিশোর চরিত্র। নানা স্তরের, কিন্তু সকলেই সংসার-অনভিজ্ঞ, মান-অভিমানের রাজ্যে সমকক্ষ।

যাদববাবুর লঞ্চ কেনা থেকেই উপন্যাসে বিশিষ্ট দিকপরিবর্তন। সমুদ্রের সাধ, ভাগ্যান্বেষণের স্বপ্ন তাঁকে দিশেহারা করেছিল। তাই সমস্ত গহনা এবং অনেক সম্পত্তি বন্ধক রেখে 'জলকন্যা' কেনার সময় বুঝতে পারেন নি, সখের লঞ্চে ব্যবসা জমে না। কিন্তু বন্ধ্যামাটির বুক চিরেও যদি ফসল ফলে, অফুরন্ত প্রাণবন্তের ভাগ্য সদয় হবে না কেন। ভিমনা যেন সেই আকাঙ্ক্ষার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মূর্তি। হোসেন মিয়ার মতো রাজাগিরির স্বপ্ন নেই তার, সে বহু দুঃখে পোড়-খাওয়া মানুষ। তীক্ষ্ণ ভিমনার স্বজ্ঞা; স্বল্পবাক বলেই হয়তো সে চরিত্র অনুধাবনে নির্ভুল। তার প্রভুভক্তি আরব্য গল্পের দৈত্যের মতো। তবে হোসেন ও ভিমনা দুজনেই নির্ভীক পুরুষকারের প্রতীক। নাগার গ্রামীণ, সরল শিশুমন প্রথমে ভিমনাকে গ্রহণ করতে

পারে নি। ভিমনাও নাগাকে লঞ্চে নিতে রাজি নয়। সমুদ্র তো স্বপ্ন নয়, পদে পদে বিপদ, ঝড়, শত্রু, বিপর্যয়! নাগা, নকুল, পরেশের মতো মাঝির কাছে যাদববাবুই অভিভাবক। কিন্তু জলে অভিযানের কাজে যেন ভিমনাই প্রকৃত কর্তা। অবশ্য ভিমনা কোনো কিছু জোর করে না! তাহলে নকুলের ছেলে বলে পঙ্গু অনায়াসে 'জলকন্যা'-য় স্থান পেত না। যে আকস্মিক বিপর্যয়ে উপন্যাসের ছেদ, তা-ও অন্যরকম হতো।

যাদববাবুর চরিত্রটি বড় মধুর। তিনি যে যথেষ্ট ব্যক্তিত্বশালী নন এটাই তাঁর ত্রুটি। তবু ক্রোধ, ভালোবাসা, বিবেচনা, বিবেক সবকিছু মিলিয়ে অবিস্মরণীয়। সত্যিই যাদবাবু 'ভদ্রলোক মাঝি', করমতলার তালুকদার নেহাৎ বাইরের পরিচয়। হোসেন মিয়া কুবের-কপিলাকে চায় ময়নাদ্বীপে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য। তার কোনো মানবিক অনুভূতি নেই। যাদববাবু সকলকে খুশি দেখতে চান। কিন্তু এমন মানুষ জলযাত্রায় অচল। বিশেষত চোরাইমাল বহন করাই যেখানে কারবার। নিতাই সাহার নীতি, ব্যবসায় বুদ্ধি, নীতির চেয়ে ভিমনার কাছে 'জলকন্যা'র জলে ভাসাই ভালো। কিন্তু যাদববাবু এতে তৃপ্ত নন। তিনি চোর ডাকাতকে ঘৃণা করেন, অথচ তাদের সংসর্গেই নিজের সৌভাগ্য রচনার প্রয়াস—এহেন দ্বিধাগ্রস্ত লোকদের জন্য সংসারে কোনো স্থান নির্দিষ্ট নেই।

কিন্তু কোনো ঔপন্যাসিক জটিলতা তথা গভীরতা, কোনো গূঢ় মনস্তত্ত্বের উদ্ঘাটন বা কোনো বিশিষ্ট সমাজচেতনার পরিচয় 'মাঝির ছেলে'-তে নেই। কেতুপুরের জেলে কৃষকদের জীবনে [পদ্মা নদীর মাঝি] প্রকৃতির ভূমিকা কত অপরিহার্য একটি ঝড়েই তার সাংকেতিক পরিচয় উদ্ভাসিত। সে তুলনায় 'মাঝির ছেলে' উপন্যাসে মাঝির ছেলেদের বা তাদের কর্তা যাদববাবুর জীবনসংগ্রাম নেই, সংগ্রাম এড়িয়ে তারা সুরঙ্গপথে সৌভাগ্য খুঁজেছে। সেই অনুসন্ধানও মাঝির ছেলেদের নয়; যাদববাবু, ভিমনা, নাগার ব্যক্তিগত অনুসন্ধান। এখানেই উপন্যাসটির মৌল ত্রুটি, এবং এ-ত্রুটি মানিকবাবুর মতো শিল্পীর হাত থেকে অপ্রত্যাশিত। যখন সমাজসমস্যার অতিরেকী উল্লেখে তিনি সাহিত্যে উদ্দেশ্যপ্রাণতাকে স্পষ্ট করে তুলছিলেন, তখনই এ-উপন্যাসের বর্তমান রূপ কি করে সম্ভব হলো? তাই মনে হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে উপন্যাসটির উপসংহার অলিখিত। 'মাঝির ছেলে' 'শান্তিলতা', 'মাটি-ঘেঁষা মানুষ'-এর মতোই খণ্ডিত সৃষ্টি।

প্রথাসিদ্ধ নায়ক নায়িকাদের অন্তর্ধান ঘটেছিল 'কল্লোল' 'কালিকলম' ইত্যাদির লেখকদের রচনায়। শৈলজানন্দ কয়লাকুঠির অঞ্চলে কুলিদের মধ্যে পেয়েছিলেন বিষামৃতময় জীবনের স্বাদ; প্রেমেন্দ্র মিত্র দেখেছিলেন সমাজের 'পাঁক', "বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে"; অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত গিয়েছিলেন হাড়ি-মুচি-ডোমবায়েনদের সমাজে; তারাশঙ্কর আদিম জীবনীশক্তির প্রাচুর্য দেখেছিলেন বাগ্দী-কাহার-বেদেদের জীবনে। তখন থেকেই অ-নায়ক নায়ক এবং অ-নায়িকা নায়িকারা বাংলা গল্পের আসরে প্রাধান্য পেয়ে আসছেন। তবু মানিকবাবুর তৃতীয় পর্বের (১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬) নায়কেরা বিশেষ অর্থে 'নতুন'। ঐতিহাসিক পোলার্ড মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও শহুরে সভ্যতার প্রগতিশীল ভূমিকা সম্পর্কে লিখেছেন: "Without these two there would have been little to distinguish between modern from medieval history...When you had no middle class, you had no Renaissance and no Reformation" কিন্তু একথাও ঠিক যে সমগ্র বিশ্বেই এখন মধ্যবিত্তের অগ্রগতি ব্যাহত, এখন মজুরশ্রেণীর অভ্যুত্থানের যুগ। কার্ল মার্কসের কথায়: "The lower strate of the middle class—the small tradespeople, shopkeepers and retired tradesmen generally, the handicraftsmen and peasants—all these sink gradually into the proletariat." মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় পর্বের নায়কদের মধ্যে মধ্যবিত্তের সেই শ্রমিকশ্রেণীতে রূপান্তরের কাহিনী লিখিত হয়েছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কী নির্মম পারিপার্শ্বিকের চাপে মধ্যবিত্তরা পুরনো ভিত্তি দ্রুত হারাচ্ছে, তার আংশিক চিত্র অন্তত উদ্ঘাটিত করেছে এই সব নরনারী।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

নিশীথ কর

সাম্প্রতিক কালে বিশ্বশান্তি আন্দোলনে বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর আত্মনিয়োগ উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। তাঁর দিকে আজ বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের সপ্রশংস দৃষ্টি।

কিন্তু শান্তির বেদীতে আত্মাহুতি ছাড়াও—তাঁর সৃজনশীল সাংস্কৃতিক অবদানের পরিমাণ যথেষ্ট। সেই অবদানকে মোটামুটি দু-ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রচনা এবং সামাজিক রচনা। তাঁর বৈজ্ঞানিক রচনা স্বল্প হলেও তা অভিজ্ঞ মনের পরিচায়ক। সেসব রচনার রসগ্রহণ বিশেষজ্ঞদের পক্ষেই সম্ভব। তবে তাঁর দার্শনিক ও সামাজিক রচনার জন্যই রাসেল পাঠক-সাধারণের কাছে সুপরিচিত। কিন্তু একটু বিশ্লেষণী মন নিয়ে এইসব রচনার গভীরে প্রবেশ করলে রাসেলের একটি অদ্ভুত আত্মকেন্দ্রিক মন যেন ফুটে উঠতে থাকে।

রাসেলের রচনায় দুটি জিনিস লক্ষ্য করা যায়। একটি তাঁর অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানী মেজাজ, অন্যটি তাঁর সংশয়ধর্মী যুক্তিপ্রবণ মন। এই দুটি নিয়েই তিনি যুক্তিবাদী-বৈজ্ঞানিক-মানবতাবাদ-প্রচারে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন। তবুও মাঝে মাঝে আমরা দেখতে পাই রাসেলের এক আত্মিক দৃষ্টি তাঁর যুক্তিধর্মী বিজ্ঞানী মনকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাই অনেক সময়ে তাঁর নিজের কাছে যা শ্রেয় বা প্রেয় তাকেই দেখি তিনি সমাজের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছেন। নিজের ভালো-মন্দ লাগাটাকেই তিনি অনেক সময়ে সামাজিক নীতিবোধের মাপকাঠি করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন: "Ethical argument could not be 'such and such a thing is good' but 'I think such and such is good'." তিনি আরও বলেছেন: "'Good' and 'Bad' are merely expressed subjective likes and dislikes." নীতিবোধের এই 'I'-এর উপর গুরুত্ব, এই Subjective likes and dislikes-এর দৃষ্টিই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেক সময়ে অযৌক্তিক ও দ্বন্দ্বমুখী করে তুলেছে।

অথচ বাস্তব জীবনকে তন্ন তন্ন করে বোঝবার জন্যে রাসেলের সংশয় ও জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। যিনি জীবন নিয়ে নানা এক্সপেরিমেণ্ট চালিয়েছেন—যিনি গণিত নিয়ে, দর্শন নিয়ে, শিশুশিক্ষা নিয়ে, রাজনীতি নিয়ে, স্ত্রীপুরুষের যৌনসম্পর্ক নিয়ে, যুদ্ধশান্তি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন; আর তার জন্য নির্যাতন সহ্য করেছেন; সেই সক্রেটিসধর্মী রাসেল-জীবনকে কখনোই বাস্তববিমুখ বলা যায় না। তবুও এই সব সমস্যা সমাধানে মাঝে মাঝে তাঁর দৃষ্টি কেমন যেন আত্মমুখী হয়ে উঠেছে। তবে বিশ্বশান্তির ব্যাপারে মনে হয় একটা ব্যতিক্রম দেখা দিয়েছে, তিনি তাঁর সেই আত্মকেন্দ্রিক জীবনে সীমিত থাকছেন না। সেখানে যেন জগতের কল্যাণে তাঁর আত্মা উৎসর্গীকৃত—তিনি বিশ্বমানবের রক্ষাকর্তা। যিশুর মতো ইংলণ্ডের ক্রুশ বহন করেও তিনি যেন বিশ্বশান্তির জন্য প্রাণ দিতে এগিয়ে চলেছেন।

কিন্তু শুধু আজকের কথা নয়। পঞ্চাশ বছরেরও অধিক সময় তিনি এই শান্তির জন্য সংগ্রাম করে চলেছেন ও তার জন্য বহু নিগ্রহও ভোগ করেছেন। রাসেল বলেছেন: "একদা আমি সাম্রাজ্যবাদীই ছিলাম। বুওর যুদ্ধে আমার পূর্ণ সমর্থন ছিল। কিন্তু ১৯০১ সালের পর থেকেই হিংসার আস্ফালনে আমার আস্থা কমতে লাগল।" আর ১৯১৪-র বিশ্বযুদ্ধ তাঁকে সম্পূর্ণ যুদ্ধবিরোধী করে তুলল। রাসেল ক্রমাগত যুদ্ধের বিরুদ্ধে লিখে যেতে লাগলেন। অগ্রণী হয়ে NCF (No Conscription Fellowship) গড়ে তুললেন। ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের নাম ও তাঁর শান্তির মতবাদ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। নিজে তো যুদ্ধবিষয়ক কোনো কাজে যোগ দিলেনই না, উপরন্তু যাঁরা যুদ্ধবিরোধী তাঁদের সপক্ষে সরবে প্রতিবাদ করলেন। এই প্রসঙ্গে বৃটিশ সরকার ও আমেরিকার ফৌজকে সমালোচনা করার জন্য ১৯১৮ সালে রাসেলের দশ পাউণ্ড খরচা সমেত একশ পাউণ্ড জরিমানা ও ছ মাস জেল হলো। যুদ্ধ চলাকালীন রাসেলের আশা ছিল হয়তো শান্তি এলে ভবিষ্যতে যাতে আর সর্বগ্রাসী যুদ্ধ না হয় তার ব্যবস্থা শান্তিকামী মানুষ করবে। কিন্তু ভার্সাই সন্ধি তাঁকে আশাহত করল। তিনি আবার যুদ্ধের আশঙ্কা করলেন এবং শান্তির পক্ষে আন্দোলন চালিয়ে গেলেন। দ্বিতীয় যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত আন্দোলন করা সত্ত্বেও—রাসেল দ্বিতীয় যুদ্ধে হিটলারের বিপক্ষে যুদ্ধকে সমর্থন করলেন। অবশ্য তাঁর অহিংসনীতির এই ব্যতিক্রম অনেকের কাছে সামঞ্জস্যহীন বলে মনে হয়েছিল। তাই প্রথম যুদ্ধের

বিরোধিতা করার পর দ্বিতীয় যুদ্ধকে সমর্থন করতে গিয়ে রাসেল অসামঞ্জস্যতার আত্মবিশ্লেষণে বললেন: "যুদ্ধের চেয়ে কাইজারের দ্বারা পরাজিত হওয়াও ভালো মনে হয়েছিল কিন্তু হিটলারের দ্বারা পরাজিত হওয়ার চেয়ে যুদ্ধও ভালো।" আসলে হিটলারের সর্বধ্বংসী যুদ্ধের বীভৎসতাই রাসেলকে যুদ্ধমুখী করে তুলল।

দ্বিতীয় যুদ্ধ শেষ হবার পর রাসেল আবার শান্তির জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন, আবার শান্তির বাণীপ্রচার শুরু করলেন। এবার কিন্তু শান্তি-প্রচারে তাঁর অহিংসনীতিতে আরও এক বড় অসামঞ্জস্যতার উদ্ভব হলো: ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে বোমাবর্ষণ করেও শান্তি বজায় রাখার কথা বলতে লাগলেন।

এই রুশবিরোধী বোমাযুদ্ধের সঙ্গে তাঁর শান্তিনীতির সামঞ্জস্যের কথা বিশ্লেষণ করে রাসেল বললেন: "আমি ভেবেছিলাম শান্তির জন্য একটি বিশ্বশক্তি প্রয়োজন। আর ১৯৪৯-এর পূর্বে যেহেতু শুধু একা আমেরিকারই এটম বোমা ছিল তাই আমি ভেবেছিলাম শান্তির জন্য প্রয়োজন হলে ওই একক শক্তিকেই রুশের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেও শান্তি বজায় রাখা যাবে।" ১৯৪৯-এর পর রাশিয়া এটম বোমা তৈরি করে ফেলে। তখন থেকে রাসেল অবশ্য তাঁর মত পরিবর্তন করেন এবং তখন থেকে তিনি বলতে থাকেন—নিরস্ত্রীকরণ হলো বিশ্বশান্তির একমাত্র পথ। তবে তাঁর উপস্থিত মত হলো: সোভিয়েত ও আমেরিকা—এই দুটি দেশের মধ্যে চুক্তি করে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ করতে হবে। আর অন্যান্য দেশে—এমন কি ইংলণ্ডেও—বিনা শর্তে এককভাবেই নিরস্ত্রীকরণ করা হবে শান্তির অনুকূলে।

এই নিরস্ত্রীকরণের জন্য তাই রাসেল ইংলণ্ডে অহিংস আন্দোলন করতে শুরু করলেন। আর সেখানকার সকল পার্টির লোক নিয়ে গঠিত 'সদস্য-শতক' (A Committee of Hundred)-এর সভাপতিরূপে তিনি ইংলণ্ডের পারমাণবিক যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাতে লাগলেন। এই কমিটির উদ্যোগে আহূত এল্‌ডারম্যাস্টন্ (Aldermaston) মিছিলে ইংলণ্ডের শত শত সাধারণ লোক এসে যোগ দিতে লাগল। রাসেল ইংলণ্ডের শাসকশ্রেণীর চক্ষুশূল হলেন। ট্রাফালগার স্কোয়ারে সত্যাগ্রহ করার অপরাধ উনিনব্বই বছরের বৃদ্ধ রাসেল ১৯৬১ সালে আবার ইংলণ্ডের আইনে অভিযুক্ত হলেন এবং কারাবরণ করলেন। শান্তির জন্য এই নির্যাতন

ভোগ তাঁকে সারা বিশ্বের প্রশংসায় ও অভিনন্দনে ভূষিত করে তুলল।

কিন্তু বিশ্বশান্তির জন্য রাসেল যতই ব্যাকুল হয়ে উঠুন, এটম যুদ্ধের বীভৎসতায় মানুষের অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি যতই আতঙ্কিত হোন—দুঃখের সঙ্গে এ কথা স্বীকার করতে হচ্ছে যে যে-কারণে যুদ্ধের উদ্ভব হয় তার প্রতি তাঁর দৃষ্টির গভীরতা আজও যেন প্রসারিত হয় নি। কি করে শ্রেণীশোষিত সমাজ থেকে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হয়, আর সেই সাম্রাজ্যবাদ কি করে তার শোষণব্যবস্থা অন্য দেশে বজায় রাখার জন্য অনিবার্যভাবে যুদ্ধের আশ্রয় নেয়—শ্রেণীঅধ্যুষিত সমাজের সে কাহিনী রাসেলের মনে ধরে নি। তিনি মনে করেন যুদ্ধের বীজ আমাদের মনের মধ্যেই উপ্ত, আর সেখান থেকে তাকে উপড়ে ফেলতে পারলেই যুদ্ধের অবসান হবে। 'Has Man a Future?' নামক সদ্য প্রকাশিত বই-এ রাসেল এই কথাই লিখেছেন: "It is in our hearts that the evil lies and it is from our hearts that it must be plucked out." ১৯৬১-তে প্রকাশিত 'Fact and Fiction' নামক বই-এও তিনি বলেছেন: "War is due to our acquisitive tendency." এই আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টির মধ্যেই রাসেল যুদ্ধ-সমস্যার সব কারণ খুঁজে পেয়েছেন। আর তাই তাঁর সমাধানেরও পথ হলো আত্মশুদ্ধি। কিন্তু রাসেলকে এই কথা জিজ্ঞাস্য: সব দেশেরই বেশির ভাগ মানুষ তো মনেপ্রাণে শান্তি চায়—তাদের মনে তো যুদ্ধের বীজ উপ্ত নেই। যুদ্ধ তো বাধে মুষ্টিমেয় শোষক রাষ্ট্রনেতাদের প্ররোচনায়। তাদেরও এই শোষণমানসিকতা অনিবার্যভাবে উদ্ভব হয় ধনতান্ত্রিক শোষণব্যবস্থার মধ্য থেকে—দেশের মধ্যে তা শোষণের জাল ফেলে শেষে বিদেশেও জাল ফেলে। আর, এই শোষণ যাদের স্বার্থ তাদের আবার প্রয়োজন শোষণহীন সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করা—সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধানো। তাদের এই সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক নীতিই কি যুদ্ধের জন্য দায়ী নয়? আসলে বর্তমান দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে বিভেদ ও দ্বন্দ্ব বুঝতে চেষ্টা না করলে এবং সেই শিবিরের কোন পক্ষ সমর্থনযোগ্য তা স্থির করতে না পারলে, আধুনিক আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া দুরূহ। শোষণবাদী পৃথিবীতে ব্যক্তির মনে ও শ্রেণীর মনে দ্বন্দ্ব, বিক্ষোভ ও লোভ (acquisitive tendency) নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মানুষের মনে তাই

বলে মিলন, সহযোগিতা, সৌহার্দ্য, শান্তির আগ্রহ লোপ পায় না, পায় না বলেই তো সভ্যতা টিকে রয়েছে, টিকে থাকে। মনের দিক থেকেও সমস্যাটা রাসেল একপেশে করে দেখেছেন। আর মনের দিকে এত জোর না দিয়ে সমাজব্যবস্থার দিকে দেখলে তাঁর এত গোল ঘটত না।

পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যাপারে সোভিয়েত ও আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির সঠিক বিচারেও রাসেল পরাঙ্মুখ। কিন্তু সোভিয়েত যে সর্বপ্রথমে পারমাণবিক অস্ত্র বেআইনী করার কথা বলেছিল, এককভাবে পরীক্ষা বন্ধ করার যে ঝুঁকি নিয়েছিল, পূর্ণাঙ্গ নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে অস্ত্রবিলোপ করার যে পরিকল্পনা দিয়েছিল—এ সব কথার গুরুত্ব না দিলে কি ঠিক হয়? অন্য দিকে গোড়া থেকেই আমেরিকা চেষ্টা করেছে একচেটিয়া আণবিক বোমার জোরে পৃথিবীর প্রভুত্ব। তারপর গত দশ বছর ধরে শুধু যে বলে চলেছে প্রথমে তদন্ত-তদারকী এবং তারপরে নিরস্ত্রীকরণ, অর্থাৎ অস্ত্র বর্জনের প্রতিশ্রুতি না দিয়েই অন্য রাষ্ট্রের অস্ত্রভাণ্ডারের খবর নেবার অভিসন্ধি—এসব কথারও মর্মার্থ না বুঝলে কি চলে? এসব বিচার না করলে কোন রাষ্ট্র শান্তির পক্ষে আর কোন রাষ্ট্র শান্তির পক্ষে নয়, তা সনাক্ত করা দুরূহ হয়ে পড়ে। আর রাসেল তা করতে নারাজ। তিনি পক্ষ নির্বাচন করতে পরাঙ্মুখ। তাঁর নীতি হলো—দুই পক্ষকেই শান্তি বিঘ্নিত করার অপরাধে সমানভাবে দোষারোপ করা; আবার অন্যদিকে দুই পক্ষকেই শান্তিরক্ষার জন্য আবেদন জানানো।

অবশ্য এইভাবে দুই পক্ষকে সমানভাবে দোষারোপ করা রাসেল-দৃষ্টির যতই অযথার্থতা ও অবাস্তবতার পরিচয় দিক—দুই পক্ষকে সমানভাবে শান্তির জন্য আবেদন জানানোর মূল্য আছে, এ কথা স্বীকার করতে হবে। অন্তত দেশে দেশে সে আবদনে সাড়া দিয়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তাতে শান্তির পথ প্রশস্ত বই সঙ্কীর্ণ হতে দেখা যাচ্ছে না। রাসেল-দৃষ্টির বিচারে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, তিনি একটি অদ্ভুত ধরণের প্যাসিফিস্ট বা অহিংসাবাদী। অদ্ভুত বললাম এই কারণে যে তিনি অহিংসার নামে পূর্বে অনেক সুসঙ্গতিহীন মত বা প্রস্তাব পেশ করেছেন। তবে মোটামুটি তাঁর অহিংসনীতি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই যে তিনি সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় হিংসার কারণ নির্দেশ না করে মানুষের বিবেককে যুদ্ধের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করতে চান। এই কাজে তিনি তাঁর নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে

সকল দল, মত ও আদর্শের লোক নিয়ে ইংলণ্ডে শান্তি অভিযান চালাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, অন্যান্য বিশ্বশান্তি আন্দোলনেও উদ্যোগী হয়ে উঠেছেন।

এই উদ্দেশ্যে কয়েক বছর পূর্বে পাগওয়াশ (Pagwash)-এ যে সর্বদলীয় সভা আহূত হয় তাতে বিশ্বশান্তির পক্ষে রাসেলের আবেদন হয়েছিল মর্মস্পর্শী। এর পরে ওই একই ভিত্তিতে ১৯৬১ সালে লণ্ডনে যে বে-সরকারী শান্তি সভা হয় তাতেও রাসেলের ভূমিকা প্রশংসনীয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই সভার আহ্বায়কদের মধ্যে ছিলেন ইংলণ্ড থেকে রাসেল, বার্নাল, লর্ড বয়েড অর্; ফ্রান্স থেকে জাঁ-পল-সার্ত্র; আমেরিকা থেকে এ্যরিস ফ্রোম, হোমার জগল্, হিউগো উথা; আর ভারতবর্ষ থেকে ছিলেন বিনোবা ভাবে, জয়প্রকাশ নারায়ণ, ডি-ডি-কোশাম্বী প্রভৃতি। এই জুলাই মাসে মস্কোতে বিশ্বশান্তি সংসদের উদ্যোগে যে সর্বদলীয় নিরস্ত্রীকরণ কংগ্রেস বসবে রাসেল তারও অন্যতম আহ্বায়ক। আর ভারতবর্ষে জুন মাসে গান্ধী সংসদের যে বিশ্বশান্তির সভা হলো সেখানেও রাসেল আমন্ত্রিত নেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

সর্বদলীয় শান্তিসভা অবশ্য পূর্বে হয়েছে। তবে এই ধরণের শান্তি আন্দোলন পূর্বে হয়েছে বলে মনে হয় না। এত বিভিন্ন রাজনৈতিক মতের লোক এইভাবে ইতিপূর্বে এক সভায় মিলিত হন নি এবং দেশে দেশে শান্তি-অভিযান পূর্বে এত বিস্তৃতিলাভও করেনি। তাই মনে হয় রাসেল অনুসৃত শান্তির পথ হয়তো আশার আলোক নির্দেশ করবে। আর দেশে দেশে এই শান্তি সভা ও অভিযান যদি মানুষের বিবেকবুদ্ধিকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে উদ্বেলিত করে তুলতে পারে, তাহলে হয়তো যে ভাবী যুদ্ধের অমানিশা মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলেছে তা চিরকালের জন্যই দূরীভূত হবে।

বর্তমান কালে এই শান্তির প্রশ্ন ছাড়া, অন্য প্রশ্নে রাসেলের ভাগ্যে জনপ্রিয়তা বেশি জোটে নি। কারণ জনপ্রিয়তার যে সহজ পথ হলো জনমতের স্রোতে গা ভাসানো তাতে তিনি কখনোই সায় দিতে পারেন নি। বরং সেই স্রোতের বিরোধিতাই তিনি আজীবন করে এসেছেন।

যুদ্ধের বিরোধিতা করে তিনি ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শাসকদের কাছে প্রিয় হতে পারেন নি। ধর্মের বিরোধিতা করার জন্য তিনি প্রাচীনপন্থী মানুষের কাছে অপ্রিয়। কমিউনিজমের বিরোধিতা করেন বলে সমাজতন্ত্রী

দেশের লোক তাঁকে অপছন্দ করে। আর প্রায় বাধাহীন যৌনসম্পর্কের মতবাদ প্রচার করায় অনেক দায়িত্ববোধযুক্ত লোকই তাঁকে গ্রহণ করতে ভয় পায়। ফলে মানুষটাকে 'বিপজ্জনক পাগল' আখ্যাত হয়ে অনেক দেশে দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে। অথচ মানুষটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকে আশ্রয় করে সমাজে যা কিছু অযৌক্তিকতা ও গোঁড়ামীর প্রশ্রয় দেয় তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তাঁর বিদ্রোহী বৈজ্ঞানিক মন সমাজের প্রচলিত গোঁড়া মতের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে নি বলেই তাঁর ভাগ্যে জুটেছে এত দুর্ভোগ। সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে তাঁর তীক্ষ্ণ সমালোচনার প্রধান কারণ তাঁর উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ। তাঁর মতন ব্যক্তিত্বের পক্ষে ইংলণ্ডের বুর্জোয়া সমাজে যে পরিমাণ স্বাধীনতা আছে—সোভিয়েত রাশিয়ায় সমগ্র সমাজের নিরিখে সেই স্বাধীনতার উপর যুক্তিসঙ্গত সীমা আরোপ করা প্রয়োজন হতো—এরূপ বোধই মনে হয় তাঁকে সমাজতন্ত্রের প্রতি বিমুখ করে তুলেছে। রাসেলের কাছে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের উপর যে কোনো রকম বাধা নিষেধই একেবারে অসহ্য। অনন্যসাধারণ প্রতিভা-ভাস্বর রাসেলের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধও অনন্য। এই অত্যুগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধই তাঁকে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে মুখরা করে তুলেছে। তবে রাসেল অপ্রিয়বাদী হলেও স্পষ্ট বক্তা। কারণ তিনি যা ভালো বুঝেছেন তা-ই তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন—যদিও তাঁর সেই ভালোমন্দ বোঝাটা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও আত্মকেন্দ্রিক দোষে দুষ্ট। তাঁর বক্তব্যের সুস্পষ্টতার জন্য তাঁর রচনা সব সময়েই স্বচ্ছ।

রাসেল তাঁর প্রখ্যাত 'A Free Man's Worship' প্রবন্ধে এবং 'Why I am not a Christian' বইটিতে ধর্মের সকল গোঁড়ামি, সকল অযৌক্তিক বিশ্বাসকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। কিন্তু ওই গোঁড়ামিই তিনি আবার কমিউনিজমের মধ্যে দেখে তাকে এক প্রকার যুক্তিহীন ধর্ম বলে গ্রহণ করতে নারাজ হয়েছেন। 'Why I Oppose Communism' বইখানি এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা। 'Practice and Theory of Bolshevism' বইটিতে আছে মার্কসবাদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকে সমালোচনা। 'Freedom and Organisation' বইখানিতে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের সঙ্গে মার্কসীয় তত্ত্বের সমালোচনাও সন্নিবেশ করা হয়েছে। 'উদ্বৃত্তমূল্যতত্ত্ব' ('থিওরি অব্ সারপ্লাস ভ্যালিউ'), 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ', 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ'—সবকিছুর বিস্তৃত আলোচনা ও সমালোচনা শেষোক্ত বইগুলিতে পাওয়া যায়।

রাসেলের এসব বই-এর লিখনশৈলী এত সহজ ও সুন্দর যে তা সকল মানুষেরই উপভোগের সামগ্রী। মার্কসবাদ সম্বন্ধে এসব রচনা এত বাস্তবানুগ যে বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও তা তৃপ্তিকর কৌতূহল উদ্রেক করে। স্পষ্ট মনে পড়ে তিরিশ দশকে যখন এদেশে মার্কস-এঙ্গেল্‌সের বই ছিল দুর্লভ, তখন রাসেল-লিখিত এইসব বই পড়েই বহু লোক মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। জেলে বসে বহু সন্ত্রাসবাদী সেদিন রাসেলের 'Freedom and Organisation' পড়তে পড়তে দৃষ্টির রূপান্তর ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে ধীরে ধীরে পা বাড়িয়েছিলেন।

তবে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তিরিশ চল্লিশ বছর পূর্বে লেখা রাসেলের এসব সমালোচনার বোধহয় আজ আর উত্তর নিষ্প্রয়োজন। কারণ, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূলগত নির্ভুলতা আজ বাস্তব সত্য; সমাজবিবর্তনে শ্রেণীদ্বন্দ্বও অল্পবিস্তর প্রায় সর্বত্রই স্বীকৃত; আর আধুনিক বিজ্ঞানে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের অনেক কথাই সমর্থিত। তবে বিশুদ্ধ দার্শনিক আলোচনার সমাধান বোধহয় দুষ্প্রাপ্য। কারণ, রাসেল নিজেই ভাববাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে দার্শনিক জীবন শুরু করেছিলেন। পরে কিন্তু বিশুদ্ধ নৈয়ায়িক জালে জড়িয়ে একপ্রকার প্রচ্ছন্ন ভাববাদের কাছেই আত্মসমর্পণ করলেন। তাছাড়া, সাম্প্রতিক ইতিহাসের খবর রাখলে রাসেল-খণ্ডন বাহুল্য বলে মনে হতে পারে। গত চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের যে অগ্রগতি ঘটেছে তাকেই বলা যেতে পারে মার্কসীয় অর্থনীতির বিরুদ্ধে সমালোচনার মূর্ত খণ্ডন। আর মার্কসবাদেরও শতায়ু উত্তীর্ণ—এই শতাব্দীকালের ব্যবধানে তাকে হত্যা করার নিরন্তর প্রচেষ্টার ব্যর্থতাও মার্কসবাদ খণ্ডনের মূর্ত অস্বীকৃতি বলা যেতে পারে। অবশ্য মার্কসবাদের মূল তত্ত্বের ব্যতিক্রম না ঘটলেও—দেশান্তরে ও কালান্তরে তার রূপের পরিবর্তন যে ঘটছেই, এ কথা স্বীকার করতে হবে। বাস্তবের নিকষে নীতির ও কৌশলের যাচাই না করলে মার্কসবাদ তো বস্তুবাদ থাকত না।

কিন্তু রাসেলের একটি সমালোচনার কথা অনেকের মনেই রেখাপাত করেছে। সে সমালোচনার মধ্যে হয়তো সংযমনের অভাব আছে—কিন্তু তাই বলে তাকে এড়িয়ে যাবার প্রবৃত্তি আমাদের পলায়নী মনের পরিচয় দেয়। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে—সোভিয়েত সমাজের অগ্রগতি

কোনোদিনই বিরূপ সমালোচনায় প্রতিহত হয় নি বরং সমালোচনার অন্তর্নিহিত সত্যটুকুর স্বীকৃতিতে তার গৌরব বেড়েছে আর যা মিথ্যা তার মৃত্যু ঘটেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রীয় শক্তির কেন্দ্রীয়করণের বিরুদ্ধে তিনি যে আপত্তির কথা তুলেছেন তা অনেক মানুষের মনেই একটি প্রশ্নাকারে দেখা দিয়েছে। ১৯৪১ সালে লিখিত 'Power' বইখানিতে রাষ্ট্রীয় শক্তির নিরঙ্কুশ কেন্দ্রীয়করণের কুফল সম্বন্ধে রাসেল খুব হুঁসিয়ারী করেছিলেন ফ্যাসীবাদের ও কমিউনিজমের বিরুদ্ধে। আর ১৯৬১ সালে লিখিত 'Fact and Fiction' বইটিতে তিনি বলেছেন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসে তাঁর পূর্ব-উল্লিখিত সব আশঙ্কাই স্তালিনের কার্যকলাপের বিবরণে সমর্থিত হয়েছে। আর স্তালিনের রাজত্বে যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটেছে তাকে শুধু ব্যক্তিগত ত্রুটিবিচ্যুতি বলে ব্যাখ্যা দিলে অগভীর রাজনৈতিক দৃষ্টির পরিচয় দেওয়া হবে। সেই ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটবার যে অগণতান্ত্রিক পথ রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে ছিল সেই দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে তার পথনিরোধ প্রচেষ্টাই বেশি করে করা উচিত ছিল। তা না করতে পারলে, স্তালিনের রাজত্বে যা ঘটেছে তা যে ক্রুশ্চেভের রাজত্বে বা পরবর্তী কোনো রাষ্ট্রনায়কের রাজত্বে পুনরায় ঘটবে না তার গ্যারান্টি কোথায়? এই প্রশ্ন—অনেকের মনেই প্রশ্ন হিসাবে আজও রয়ে গেছে।

বলা বাহুল্য ১৯২০ সালে রাসেল রুশ দেশ দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যখন সেখানে যান তখন সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত অনগ্রসর। রাসেল তখনকার রুশ দেশ দেখে তাই সন্তুষ্টিলাভ করতে পারেন নি।

তবে রাসেল-চিত্তের অন্তর্দ্বন্দ্ব বোঝা যায় যখন দেখি মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের খণ্ডনলীলা সমাপ্ত করার পর তিনি অন্য এক ধরনের সমাজতন্ত্রকেই সমর্থন করলেন। ধনতন্ত্রের সমর্থক তিনি হলেন না এবং সাম্রাজ্যবাদেরও তিনি বিরোধী।

রুশ দেশ থেকে ফিরেই—১৯২০ সালেই তিনি চীন গেলেন। চীনের সুপ্রাচীন সভ্যতার তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে লাগলেন। সেখানে গিয়েই তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা করলেন, চীনের ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা দাবি করলেন। 'Problem of China' বইখানি আজও তাঁর প্রগতিদৃষ্টির

পরিচয় দেয়। তবে আবার সেখানকার কমিউনিজমের প্রতিও তাঁর সমালোচক দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর।

একটি কথা মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংলণ্ডের একদল বুদ্ধিজীবী ধনতন্ত্রের জঘন্য রূপ দেখে সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছিলেন—অথচ পুরোপুরি মার্কসীয় সমাজতন্ত্র গ্রহণ করতে পারেন নি। রাসেল তাঁদের মতনই এক ধরনের Guild Socialism-এর সমর্থক হয়েছিলেন।

রাসেল-চিন্তার মূল্যায়নে তাই শুধু এই কথাটুকু মনে রাখতে হবে যে তিনি কমিউনিস্টবিরোধী ; কিন্তু তা বলে প্রতিক্রিয়ার সমর্থক নন। শ্রেণী-দৃষ্টিতে তাঁর শ্রমিক-চক্ষুর উন্মেষ হয় নি সত্য—তাই কড্‌ওয়েল, বার্নাল, হলডেন, ডব্‌, লিউইসের পথ তাঁর চোখে পড়ে নি। কিন্তু তাই বলে তিনি চার্চিল, ইডেন, ম্যাক্‌মিলনপন্থীদেরও পথের পথিক নন।

চীন থেকে ফিরে রাসেল শিশু-শিক্ষা নিয়ে মাতলেন। সাধারণভাবে তাঁর শিক্ষার মূলমন্ত্র হলো—সব গোঁড়ামি নিরাকরণ করে, নির্বিচারে কোনো কিছুকেই গ্রহণ না করে, বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসু মন গড়ে তোলা। ১৯২৭ সালে বেকন হিলের কাছে তিনি একটি ছোট স্কুল গড়ে তুললেন। তাঁর স্ত্রীর সাহচর্যে বার্ট্রাণ্ড রাসেল এক্সপেরিমেন্ট চালাতে লাগলেন শিশু-শিক্ষার ভিত্তিটিকে বদল করার জন্য। রাসেল প্রচলিত শাসনমূলক শিশু-শিক্ষার পক্ষপাতী কখনোই ছিলেন না। এমন কি যুদ্ধের অন্যতম কারণ হিসাবে রাসেল শিশুপীড়ক শিক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করলেন। শিশুর স্বাধীন ব্যক্তিবিকাশে বাধা দিলে স্বভাবতই তার অন্তরাশ্রিত আবেগ নিরুদ্ধ আক্রোশে ও হিংসায় আন্দোলিত হয়ে ওঠে, পরে সেই হিংসা যুদ্ধে প্রকাশ পায়। কিন্তু রাসেলের সে মতবাদ সেদিন ইংলণ্ডে কেউই গ্রহণ করতে বিশেষ আগ্রহান্বিত বোধ করে নি। পরে ডোরা রাসেলের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের পর তাঁর সে বেকন স্কুল উঠে যায়। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে যদিও রাসেলের শিশু-শিক্ষার মূলে একটি আত্মকেন্দ্রিক মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি পরিস্ফুট—তথাপি তাঁর সাধারণ শিক্ষাতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসু মেজাজটির মূল্য আছে; বিশেষ করে আজকের দিনে তার গুরুত্ব অনেক

১৯২৯ সালে 'Marriage and Morals' বইটি প্রকাশিত হলো। যৌনমত সম্পর্কে সে এক যুগান্তরকারী বই। সে বই পড়ে নি এমন যুবকের সংখ্যা স্বল্প। সে বই-এর বিষয়বস্তু সবিস্তারে আলোচনা করতে গেলে আমাদের দেশের শালীনতাবোধের মাত্রা বজায় রাখা দুষ্কর। আর যৌনসম্পর্কে এই শালীনতাবোধের বিরুদ্ধেই রাসেলের জেহাদ। অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রয়েড ও হ্যাবলক এলিসের বিস্তৃত যৌনআলোচনায় পূর্বের যৌননীতিবোধ অনেকাংশে আঘাত পেয়েছিল। তবে সে আলোচনার মধ্যে দেহতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানীদৃষ্টির আংশিক পরিচয় ছিল। কিন্তু রাসেল স্ত্রী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্কের মূলেই যেন আঘাত হানলেন। অবশ্য এই আঘাত হানার মূলে ছিল রাসেলের মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি। সমাজে যৌনসম্পর্কে যে অবাধ 'স্বাধীনতা' মানুষের 'মন' চায় তাকেই হয়তো তিনি সামাজিক স্বীকৃতি দিতে চাইলেন। মনস্তত্ত্বকেই বোধহয় তিনি যৌননীতিবোধের মাপকাঠি করলেন। তাই সমাজে স্ত্রী-পুরুষের যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে রাসেল যে কথা খোলাখুলিভাবে বললেন তা বোধহয় ইতিপূর্বে আর কেউ বলতে সাহস পায় নি। রাসেল বললেন: "Marriage should not regarded as excluding outside sexual relations; and that husbands instead of restraining their inclinations in this regard should confine themselves to restraining any jealousy at similar infidelities by their wives." রাসেলের মতে: "Adultery should not in itself be a ground for divorce."

এই সব কথা প্রচলিত যৌনমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে মনে হলো; শুধু তাই নয়, রাসেল এই সব কথাকে নিজের জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন। ডোরা রাসেলের সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদের অপ্রীতিকর অন্যান্য যৌনসম্পর্কের প্রকাশিত সংবাদে বহুলোক অস্বস্তিবোধ করলেন। এর পরেও রাসেল একাধিক বিবাহ করলেন এবং বিবাহবিচ্ছেদও করলেন। অনেকেই রাসেলের এই মতকে সুস্থচিত্তে গ্রহণ করতে পারলেন না। তাঁর এক জীবনীলেখক ব্যঙ্গ করে লিখলেন: "By the end of life Russell had married four times and he had other friendships which were not Platonic!"

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও তিনি অবাধ যৌনসম্পর্কের মত প্রচার করতে লাগলেন। তিনি বললেন: "University students should enter into temporary childless marriage (companionate marriage), for that would make them better both intellectually and morally." ১৯৪০ সালে সিটি অফ নিউইয়র্ক কলেজে দর্শনের অধ্যাপকের পদটি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই সব মতবাদ প্রচার করার জন্য কিছুদিনের মধ্যেই এক বিবাহিত মহিলা তাঁর বিরুদ্ধে মামলা আনলেন এই অভিযোগে যে তিনি দর্শনশিক্ষার নামে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যথেচ্ছ যৌনচর্চার মতবাদ প্রচার করছেন। নিউ ইয়র্কের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি রাসেলের নিয়োগ বাতিল করে দিলেন এই বলে যে তিনি দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষকতা করার পক্ষে অনুপযোগী। পরে রাসেল আবার কাজ নিলেন বার্নেস ফাউণ্ডেশনে; কিন্তু সেখান থেকেও তাঁকে ওই একই কারণে বরখাস্ত করা হলো। আমেরিকার মতন দেশে রাসেলের এই যৌনমতবাদের যদি এমন অবস্থা হয়, তাহলে সহজেই অনুমেয় আমাদের মতন দেশে তা কতটা গ্রাহ্য হবে।

তবে রাসেলের যৌনমতের পরিণাম যাই হোক—প্রত্যেক সমাজেই যৌননীতিবোধ ও বাস্তবপরিস্থিতির মধ্যে এত পার্থক্য যে বাস্তবপরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যৌননীতিবোধের মাপকাঠির পুনর্বিচারের প্রয়োজন ছিল। পরীক্ষামুলকভাবে এই কাজই রাসেল করতে গিয়ে দুর্নাম অর্জন করেছেন সত্য; তবে তাঁর যৌনমতামত সম্বন্ধে সঠিক রায় হয়তো ভাবীকাল ও সমাজ দিতে পারবে।

এখানে শুধু এইটুকু উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে সোভিয়েত দেশে যৌনসম্বন্ধের ব্যাপারে যাঁরা কাল্পনিক ধারণা পোষণ করেন তাঁদের জানা উচিত যে সে দেশে নর-নারীর সম্পর্ক ইওরোপের অন্যান্য বুর্জোয়া দেশগুলির চেয়ে অনেক সংযত ও সুস্থ এবং বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যাও অনেক কম। তাই মনে হয় সোভিয়েত সমাজের যৌনমতই হয়তো ভাবীকালের সুস্থ যৌন-সম্পর্কের পথ নির্দেশ করবে।

রাসেল মূলত দার্শনিক। যদিও তাঁর অন্যান্য বিষয়ের মতামত তাঁর দর্শন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায়। তবু তাঁর অন্যান্য বিষয়ের মতবাদের

মতন তাঁর দর্শনের মূলেও যেন দেখতে পাই একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মমুখীনতা ফুটে উঠছে। জন্ লুইস তাই বলেছেন: রাসেল হলেন আঠার শতকের "aristrocratic individualist"।

শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত রাসেলের দর্শন-জীবনের ইতিহাস সুদীর্ঘ। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে তাঁর দার্শনিক মতামতের যে উদ্ভব হয়েছে তারও কাহিনী কম দীর্ঘ নয়। রাসেলের পিতামাতা দুজনেই লর্ড-পরিবারভুক্ত ছিলেন। রাসেলের পিতা কিন্তু ছিলেন নাস্তিক। তিনি চেয়েছিলেন ছেলের দীক্ষা হোক নাস্তিকতায়। সেই উদ্দেশ্যে তিনি ইচ্ছাপত্রে দুজন নাস্তিক অভিভাবকেরও নাম উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু কোর্ট ইচ্ছাপত্রকে উড়িয়ে দিয়ে রাসেলকে ন্যস্ত করেছিল খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী ঠাকুরদা-ঠাকুরমার হাতে।

শৈশবে রাসেলের শিক্ষালাভ হয়েছিল নিজের বাড়িতেই। এগারো বছর বয়সে ইউক্লিডের জ্যামিতি পড়তে পড়তে রাসেল অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন বিষয়টির নতুনত্বে। তাঁর পরবর্তী জীবনের গণিত প্রতিভার উন্মেষের উৎস হিসাবে ইউক্লিডের যুক্তিসজ্জাকে দায়ী করা যেতে পারে। বাড়ির গ্রন্থশালায় তাঁর কৈশোরের নিঃসঙ্গ দিনগুলি রাসেলকে গ্রন্থমুখ করে তুলেছিল। ধর্মবিষয়ক বই পড়তে প্রথমে তিনি বেশ ভালোবাসতেন। কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাসের ঘোর তাঁর বেশি দিন টেকে নি। সৃষ্টির প্রথম কারণের প্রচলিত যুক্তির ফাঁকিটাকে রাসেল ধরেছিলেন মিলের আত্মজীবনী পড়ে। "আমার পিতা একদিন বলেছিলেন যে 'আমাকে কে সৃষ্টি করেছেন?'—এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই; কারণ এর পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে 'ঈশ্বরকেই বা কে সৃষ্টি করল?'—"মিলের এই তীক্ষ্ণ যুক্তির কথাগুলি পড়তে পড়তে রাসেল তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। কৈশোরে শেলি ছিলেন তাঁর মনের কবি। বায়রণে, টেনিসনে রাসেলের অনুরাগ ছিল না। রুশ লেখকদের মধ্যে টুর্গেনিভ তাঁকে খুব প্রভাবান্বিত করেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা তিনি বলেছেন—টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি তাঁর মনের উপর ছাপ ফেলতে পারে নি।

আঠেরো বছর বয়সে বাড়ির গ্রন্থশালা ছেড়ে রাসেল সোজা এসে ভর্তি হলেন কেম্ব্রিজে। সেখানে হেগেলীয় দার্শনিক জে. এম. ই. ম্যাক্‌ট্যাগার্ট, লোয়েস ডিকিনসন্, ট্রেভলান, জি. ই. মুর তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পরবর্তীকালে মুর তাঁর দার্শনিক মতবাদকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিলেন।

এঁরা সকলেই তখন লালিত হচ্ছিলেন হেগেলীয় দর্শনের ছত্রছায়ায়। রাসেলও এঁদের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু কেম্ব্রিজের প্রথম তিন বছর গণিতের বাইরে মন মেলবার তাঁর কোনো অবসর ছিল না। চতুর্থ বছরে তিনি দর্শনচর্চা শুরু করেছিলেন এবং ক্রমশ হেগেলে (কিছু পরিমাণে কাণ্টেও) তিনি আসক্ত হতে থাকেন।

রাসেল কেম্ব্রিজ ছাড়লেন ১৮৯৪ সালে। তারপর কিছুকাল তাঁর কাটে বিদেশে—প্যারিসের বৃটিশ দূতাবাসে তিনি চাকরী নিয়েছিলেন। চাকরী তাঁর ভালো লাগেনি। চাকরী ছেড়ে গেলেন বার্লিনে—সেখান থেকে আমেরিকায়। পরে ইংলণ্ডে ফিরে তিনি মন দিলেন দর্শন ও গণিতের গ্রন্থরচনায়।

নানা কারণে ১৮৯৮-এর পর থেকেই কাণ্ট ও হেগেলের মতবাদে তিনি আস্থা হারাতে লাগলেন। হেগেলের 'গ্রেটার লজিকে'র গণিত-প্রসঙ্গ তখন থেকেই তাঁর কাছে অর্বাচীন উক্তি বলে মনে হয়েছিল। তাঁর কেম্ব্রিজ-বন্ধু মূরও হেগেলান্ধ ছিলেন। কিন্তু হেগেলের প্রভাবের ঘোর কেটে মূর যখন বেরিয়ে এলেন, রাসেলও সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অনুসরণ করলেন। কাণ্টের বিরুদ্ধে তাঁর গ্রন্থ-সঙ্গী ছিলেন হারভার্ডের হোয়াইট হেড্। হোয়াইট হেডের সাহচর্যে তাঁর বিখ্যাত বই 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা' প্রকাশিত হলো। তর্কশাস্ত্র ও গণিতের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণের প্রচেষ্টা হিসাবে 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা' একটি অভূতপূর্ব ও চিরস্মরণীয় রচনা। অবশ্য এই বই-এর মর্মার্থ বোধহয় পৃথিবীর এক ডজন লোকও গ্রহণ করতে পারেন কি না তা বলা শক্ত।

এর পর তিনি একটির পর একটি দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করতে লাগলেন। অন্তত বিশটির অধিক তাঁর দার্শনিক রচনা—তার প্রত্যেকটিই উল্লেখযোগ্য। রচনাশৈলীর চমৎকারিত্বে, যুক্তির সরসতায়, বক্তব্যের স্বচ্ছতায় তাঁর প্রত্যেক দার্শনিক রচনাই বহুজন উপভোগ্য। দ্বিতীয় যুদ্ধের শেষাশেষি তিনি লিখলেন 'এ হিস্ট্রি অব ওয়েস্টার্ন ফিলজফি'। এই বই-এ তিনি দেখালেন—একদিকে দার্শনিকদের চিন্তা সামাজিক অবস্থার ফল, অপরদিকে সেই দার্শনিক চিন্তাই আবার সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বুর্জোয়া দার্শনিকদের মধ্যে দর্শনের ইতিহাস লেখার প্রচেষ্টা রাসেলেরই প্রথম। এই রচনার পর ১৯৫০ সালে রাসেল পেলেন সাহিত্যের নোবেল

পুরস্কার। বলা বাহুল্য এই বই-এর পরিপ্রেক্ষিত কিন্তু মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি নয়। তবুও এ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অনেক পরিমাণে সমাজসচেতনতা আছে।

কিন্তু রাসেল-দর্শনের মূল প্রচেষ্টা হলো : দর্শনে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতিষ্ঠা করা।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংলণ্ড ও আমেরিকার একদল দার্শনিক লাগলেন ভাববাদ-খণ্ডন-প্রচেষ্টায়। বিশেষ করে বার্কলির ভাববাদের কথা : বস্তু মনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল—এর বিরুদ্ধেই সকলের জেহাদ। বস্তুর যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তা যে মানস-নির্ভর নয়—এই কথা প্রমাণ করার প্রচেষ্টাতেই বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা দল বেঁধে লাগলেন। মূর ছিলেন এই বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের নেতা, আর রাসেলও তাঁর দার্শনিক বন্ধু মূরের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন।

রাসেলের এই দার্শনিক জীবনের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে—তবে তাঁর শেষ ও পরিণত দর্শন হলো 'নব্য-বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ'। বস্তু ও মন নিয়ে এই দর্শন-আলোচনার শুরু। বিষয়টি অমূর্ত বলে একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন ; নয় তো রাসেলের দর্শন-দৃষ্টিভঙ্গিটি বোঝা যাবে না। তিনি বলতে চান—আমরা বস্তুকে সরাসরি জানতে পারি না। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তুর বিভিন্ন দিকের সাক্ষাৎ পাই। বস্তুর এই বিভিন্ন দিকগুলির নাম 'ইন্দ্রিয়োপাত্ত' বা sensedata। রাসেলের অতিপরিচিত উদাহরণটি নিলে বোধহয় কথাটা স্পষ্ট হবে। মনে করা যাক একটি টেবিল সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ ঘটছে। এখানে কি সম্পূর্ণ টেবিলটারই সন্ধান আমি পাচ্ছি ? তা সম্ভব নয়। যখন টেবিলের এক পিঠ দেখছি, তখন কি অন্য পিঠ চোখে পড়ে ? না, তা পড়ে না। তাই মন-নিরপেক্ষ টেবিল বাইরে থাকলেও—সে টেবিলকে যখন প্রত্যক্ষে আমি পাই তখন তার সম্পূর্ণটা একসঙ্গে পাই না। প্রত্যক্ষে যে জিনিসের প্রকাশ সে জিনিস মন-নিরপেক্ষ হলেও বহির্বস্তুর সমগ্র সত্তা নয়। যেটুকু প্রত্যক্ষ করা যায় সেটুকুর নামই ইন্দ্রিয়োপাত্ত। রাসেলও তাই ইন্দ্রিয়োপাত্ত-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, ইন্দ্রিয়বোধের সময় যেটুকু সাক্ষাৎভাবে জানি তার নাম দেওয়া হয় ইন্দ্রিয়োপাত্ত। যেমন, রঙ, শব্দ, গন্ধ, কাঠিন্য ইত্যাদি। এই সব জিনিসকে সাক্ষাৎভাবে জানার সময় কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যখন প্রথম সংস্পর্শ ঘটে তাকে বলে সংবেদন। চোখে রঙ দেখলে রঙের সংবেদন ঘটে, কিন্তু তা বলে

রঙ জিনিসটা সংবেদন নয়—সেটা ইন্দ্রিয়োপাও। এখন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে যে ইন্দ্রিয়োপাওগুলি আমরা পাই সেগুলির সমষ্টি হয় ওই টেবিলটি।

কিন্তু প্রশ্ন হলো: ইন্দ্রিয়োপাও-এর সঙ্গে বহির্জগতের টেবিলটির সম্পর্ক কি? রাসেল এর উত্তরে বলেন: বর্হিজগতের ওই বস্তুটি ন্যায়শাস্ত্রের সৃষ্টি, বাহ্যিক পদার্থ নয়। কিন্তু তা যদি না হয়, তা হলে বিভিন্ন মানুষ যেহেতু বিভিন্ন ইন্দ্রিয়োপাও-এর সন্ধান পায়, সেই হেতু ইন্দ্রিয়োপাও অতিরিক্ত বহির্বস্তু না মানলে স্বীকার করতে হবে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন জগতের অধিবাসী। আর সবগুলি জগতই সমান সত্য—কোনোটিই মিথ্যা নয়, কারণ রাসেলের মতে ইন্দ্রিয়োপাও শুধু সত্য নয়, তার সত্তা মানস-নিরপেক্ষ। তা হলে প্রশ্ন হলো: সাধারণ মানুষ যে মনে করে তারা সবাই একই জগতে বেঁচে আছে, সেটা একটা প্রকাণ্ড কুসংস্কারমাত্র? রাসেল এর উত্তরে বলেন, হ্যাঁ, এই এক জগতের ধারণাটা সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে পাওয়া বিভিন্ন জগতের একটা কাজ চালানোর মতো সমন্বয়; মূর্তভাবে সত্যিই একে পাওয়া যায় না; পাওয়া যায় নৈয়ায়িক বা লজিকের বিচারে।

রাসেলের জগৎ তাই লজিকের সৃষ্টি। আর লজিক যেহেতু মানুষের মনের সৃষ্টি সেহেতু রাসেলের জগৎকে শেষপর্যন্ত লজিক-মানসের উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু একথা প্রচ্ছন্ন ভাববাদীদের কথা ছাড়া আর কি কথা? যে ভাববাদ খণ্ডনের এত প্রচেষ্টা, এত ঔৎসুক্য—শেষপর্যন্ত রাসেলের লজিকের পরিণতি সেই ভাববাদের কাছেই নতিস্বীকার?

রাসেলের দর্শনের এই দ্বন্দ্বের মূলেও হয়তো আছে তাঁর একটি আত্মকেন্দ্রিক মনের প্রবণতা। কিন্তু সে যাই হোক—রাসেলের শান্তির ব্যাপারে তাঁর এই আত্মিক দৃষ্টি উত্তীর্ণ। সেখানে তিনি বিশ্বমানবের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। সেখানে তাঁর দৃষ্টি উদ্ভাসিত—আর তাঁর দৃষ্টির দ্বারা আশু শান্তির পথও উদ্ভাসিত।

এই নিবন্ধের বহু অংশ নিয়েই মতপার্থক্যের অবকাশ আছে। আমরা বিশদ আলোচনা আহ্বান করছি—সম্পাদক।

বাংলায় আফ্রিকা-চর্চা

অংশুকুমার দত্ত

যাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়, তাদের দেশ, ভূগোল, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনৈতিক অবস্থা ও ভাষা-সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের স্বাভাবিক কারণে ঔৎসুক্য জাগে এবং পারস্পরিক আদান-প্রদানে নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য এইসব বিষয়ে চর্চা করতেই হয়। যে কোনো রকমের সম্পর্কের পক্ষে এ-কথা প্রযোজ্য। কারণ বন্ধুকে চেনা ও জানা যেমন প্রয়োজনীয়, শত্রুর পরিচয়ের তাগিদ তার থেকে কিছু কম নয়। বহির্বিশ্বে যে জাতি যত ছড়িয়ে পড়েছে; অন্য দেশ, অন্য জাতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ ও বৃদ্ধির সুযোগ তার তত বেশি মিলেছে। অবশ্য, ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির মান, কী ধরনের লোক বাইরে যাচ্ছে এবং ব্যক্তিবিশেষের আহৃত জ্ঞান জাতীয় স্বার্থে কাজে লাগাবার কী ধরনের সাংগঠনিক ব্যবস্থা আছে, তার ওপর নির্ভর করবে পূর্বোক্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার কার্যত কতদূর হচ্ছে।

প্রাচীন গ্রীকরা ছিল সমুদ্রচারী বণিক ও দেশবিজেতা। অন্য দেশ ও জাতি সম্বন্ধে গ্রীকরা তাই যথেষ্ট জ্ঞান রাখত। মেগাস্থেনেসের ভারত-বৃত্তান্ত আমাদের কাছে সুপরিচিত। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে জনৈক অজ্ঞাতনামা গ্রীকলেখক-সংকলিত 'পেরিপ্লাস অফ দি ঈরিত্রিয়ান সি' নামক গ্রন্থ লোহিত-সাগর, পূর্ব আফ্রিকার উপকূল ও আরব সাগর সম্বন্ধে বহুমূল্য সংবাদের আকর। পরের শতাব্দীতে রোমক সম্রাট হাদ্রিয়ানের রাজত্বকালে আলেকজান্দ্রিয়ায় রচিত ক্লডিয়ুস টলেমিয়ুস টলেমি-র ভূবৃত্তান্ত তো সে-যুগের সুপ্রসিদ্ধ ভূগোল।

সাম্রাজ্যবিস্তার ও শাসনের খাতিরে রোমক নাগরিকেরা গেছেন দেশ-বিদেশে। এঁদের অনেকে স্বীয় অভিজ্ঞতা লিখে গেছেন। তার মধ্যে স্বয়ং জুলিয়াস সীজার প্রণীত 'ডি বেলো গলিকো' বা গলদেশীয় (ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানী, হল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ডের কিয়দংশ নিয়ে গঠিত) যুদ্ধ অন্যতম।

আরব সভ্যতার সম্প্রসারণ-যুগে আরব পর্যটক, বণিক, শাসক ও পণ্ডিতেরা অন্য দেশ সম্পর্কে বহু বিবরণ রেখে গেছেন। তার মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আল বেরুণী এবং পশ্চিম আফ্রিকা সম্বন্ধে এল. বেকরী ও এল. ফজরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সর্বশেষে, ইওরোপের বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগে ইওরোপীয় পর্যটক, বণিক, ধর্মপ্রচারক, শাসক ও বৈজ্ঞানিকদের অবদানের উল্লেখ নিশ্চয়ই বাহুল্যমাত্র।

দুই

বাঙলায় যে যথেষ্ট আফ্রিকা-চর্চা হয়নি, তার একটা বড় কারণ বঙ্গদেশের সঙ্গে আফ্রিকার যোগাযোগ অকিঞ্চিৎকর। ইওরোপের অধিবাসীরা আফ্রিকায় গেছে বাণিজ্য, শাসন ও ধর্মপ্রচারে। এমন কি, ভারতের অন্য প্রদেশের অধিবাসীরাও অর্থোপার্জনার্থে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি করেছে। গত একশ বছরে সিন্ধি, গুজরাটি ও পাঞ্জাবীরা পূর্ব আফ্রিকায় এবং গুজরাটি ও তামিলেরা দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রধানত শ্রমিক ও ব্যবসায়ী হিসাবে গেছে। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক বাঙালীরা বেশি সংখ্যায় আফ্রিকা মহাদেশে যায় নি, স্থায়ীভাবে বসতি করা তো দূরের কথা। অবশ্য, ব্যক্তিগতভাবে কিছু লোক যে একেবারে না গেছে, তা নয়। এই নিবন্ধের পরবর্তী অংশে বাংলা পুস্তকতালিকায় উল্লিখিত একটি গ্রন্থের লেখক শ্রীশ্যামলাল মিত্র ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের মিশর-অভিযানে বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন। শ্রীমিত্র মিশরে জনৈক ভদ্রলোকের আতিথ্যে আপ্যায়িত হন এবং কথায় কথায় প্রকাশ পায়, গৃহস্বামী বাঙালী ব্রাহ্মণ। কৈশোরে দেশ ছেড়ে ঘুরতে ঘুরতে মিশরে এসে সেখানেই বিয়ে করে স্থায়ীভাবে সংসার পাতেন। কিন্তু এই সব ঘটনা বিচ্ছিন্ন এবং সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।

প্রশ্ন উঠবে, গুজরাটি, পাঞ্জাবী ও তামিলেরা অনেকে আফ্রিকায় যাওয়ার ফলে কি তাদের ভাষায় আফ্রিকার দেশ, জাতি, ভাষা, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে? তামিল সম্পর্কে কিছু বলা মুস্কিল। কিন্তু যতদূর জানি, গুজরাটি ও পাঞ্জাবীতে আফ্রিকা-চর্চা খুব বেশি এগিয়েছে বলে মনে হয় না।

অথচ গুজরাট ও পাঞ্জাবে আফ্রিকা-জিজ্ঞাসু পাঠকের সংখ্যা নেহাত কম

হওয়ার কথা নয়। ব্যবসায় ও চাকরীব্যপদেশে এই দুই প্রদেশ থেকে বহু লোক আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে গেছে। অতএব, নিজেদের স্থূল বৈষয়িক স্বার্থেই আফ্রিকা সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর রাখা তাদের প্রয়োজন। এ-প্রয়োজন অবশ্য অংশত মেটে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাবিনিময়ে, মৌখিক আলাপ-আলোচনায়। বাকি যেটুকু থাকে তার দাবি মিটিয়েছে ইংরাজি পত্রপত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা। ইংরাজি ভাষার প্রভুত্ব সর্বক্ষেত্রেই ভারতীয় ভাষাগুলির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল বা এখনও আছে। আফ্রিকা-চর্চাও তার ব্যতিক্রম নয়।

বাঙলাসাহিত্য অবশ্য ইংরাজি-প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রগতির পথে কিছুটা এগিয়েছে। তবু তত্ত্ব ও তথ্যপ্রধান যে কোনো বাঙলা বইকে ইংরাজি বই-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। ইংরাজি বই-এর উৎপাদনব্যয় বেশি হলেও তার বাজার বিশ্বব্যাপী। অর্থাৎ ইংরাজি গ্রন্থ-প্রকাশকের আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে এদেশের প্রকাশকদের মূলধনের তুলনা হয় না। ইংরাজি প্রকাশক বহু অর্থব্যয়ে তথ্য ও তত্ত্ববহুল গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করার ঝুঁকি নিতে পারেন। কারণ তাঁর ক্রেতারা সংখ্যায় অনেক বেশি। বাঙলা-পুস্তকব্যবসায়ীর পক্ষে যেটা সম্ভব তা হচ্ছে উৎকর্ষ সম্বন্ধে মাথা না ঘামিয়ে, বই-এর দাম কম করা, যাতে বাঙলাভাষী লোকের কাছে এর বিক্রয় বেশি হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও অসুবিধা আছে। এখনও বাঙলাদেশের সঙ্গে আফ্রিকার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নগণ্য। এবং সামান্য কয়েক বছর আগে পর্যন্ত আফ্রিকা-জিজ্ঞাসু বাঙালীর সংখ্যা ছিল একান্ত অল্প। তাই একেবারে রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার ও শিকারকাহিনী ছাড়া অন্য বই-এর চাহিদা একরকম ছিল না বললেই চলে। এ ছাড়া, আফ্রিকার নৃতত্ত্ব, প্রাণীবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গুরুতর রচনা এখনও ভাষাগত কারণে দুরূহও বটে।

তিন

এতক্ষণ আমরা ধরে নিয়েছিলুম বাঙলায় আফ্রিকা-চর্চা প্রায় হয় নি। এবার তার সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করা যাক। দেখা যাবে, বাঙলাভাষায় আফ্রিকা সম্পর্কিত বই-এর সংখ্যা খুব কম। তার ওপর, নির্ভুলতা, তথ্য-বহুলতা,

বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গ, বিচার-বিশ্লেষণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে এইসব বই আরও অনেক উৎকর্ষের দাবি রাখে।

আফ্রিকা সম্বন্ধে বাংলাভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর এক তালিকা লেখকদের নামের বর্ণানুক্রমে নিচে দেওয়া হলো। এই তালিকা-প্রণয়নে কলকাতার জাতীয় পাঠাগারের গ্রন্থতালিকা, বৃটিশ মিউজিয়াম পাঠাগারের মুদ্রিত বাঙলা গ্রন্থের তালিকা (মোট তিন খণ্ড, ১৮৮৬, ১৮৮৬—১৯১০ ও ১৯১১—১৯৩৪) এবং বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার ১৯৬০ সালের পুস্তকতালিকার সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য, এতে যে তালিকার অসম্পূর্ণত্ব ঘুচেছে এমন দাবি কেউ করবে না।

গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ [কলিকাতা—১৯৩১]
গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ। পৃথিবীর ইতিহাস : ৮ম খণ্ড—মিশর [কলিকাতা—১৯২৩]
চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ। প্রাচীন মিশর [কলিকাতা—?]
দত্ত, কালীপ্রসন্ন। বুয়র যুদ্ধ [কলিকাতা—১৯০২]
প্রিনসেপ, জেমস। প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয় [কলিকাতা—১৮৩০]
বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা। আফ্রিকার চিত্র [কলিকাতা—?]
বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র। বিদ্যাকল্পদ্রুম…ইজিপ্ত দেশের পুরাবৃত্ত : 'এনসাই-
    ক্লোপিডিয়া বেঙ্গলেনসিস'-এর ষষ্ঠ খণ্ড [কলিকাতা—১৮৪৭]
বসাক, নীলমণি। ইতিহাস সার (অর্থাৎ…ইউরোপ, আসিয়া, আফ্রিকা ও
    আমেরিকার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত) [কলিকাতা—১৮৫৯]
বসু, কৃষ্ণদয়াল। ডেভিড লিভিংস্টোন [কলিকাতা—?]
বিশ্বাস, রামনাথ। মাউ মাউ-এর দেশে [কলিকাতা—?]
    ঐ । দুরন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা [কলিকাতা—?]
    ঐ । ভয়ঙ্কর আফ্রিকা : ১ম ও ২য় খণ্ড [কলিকাতা—?]
মিত্র, শ্যামলাল। মিশরযাত্রী বাঙালী [কলিকাতা—১৮৮৪]
মুখোপাধ্যায়, অসিত ও চক্রবর্তী, মধুসূদন। আবিসিনিয়া
    [কলিকাতা—১৯৩৫]
মুখোপাধ্যায়, পৃথ্বীরাজ। আবিসিনিয়া ও ইটালী [কলিকাতা—১৯৩৬]
মুখোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ ও মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ। বুয়র ইতিহাস
    [কলিকাতা—১৯০০]
সরকার, বিনয়কুমার। বর্তমান জগৎ : ১ম ভাগ—মিশর [কলিকাতা—১৯১৫]

সর্বাধিকারী, দেবপ্রসাদ। দক্ষিণ আফ্রিকা দৌত্য কাহিনী [কলিকাতা—১৯৩৫]
সেন, চাণক্য। ধীরে বহে নীল [কলিকাতা—১৯৫৮]

উল্লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে দু-টি অনুবাদ। একটি গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের কাহিনী, অপরটি জেমস প্রিনসেপ সংকলিত প্রাচীন ইতিহাসের অনুবাদ। ভ্রমণকাহিনী ছ-টি, তার মধ্যে তিনটি রামনাথ বিশ্বাসের লেখা। বাকি তিনটি ভ্রমণকাহিনী নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের মিশর ভ্রমণকাহিনী নিছক গতানুগতিক পিরামিড দর্শন ও প্রাসাদোপম হোটেলে রাত্রিবাসের কাহিনীই নয়। সারা গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে অনেক সারগর্ভ আলোচনা। পাঠকের চমক লাগবে লেখকের বহু বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্যে। শ্রীদেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর ভ্রমণকাহিনী উল্লেখযোগ্য তার ঐতিহাসিক গুরুত্বে, কারণ দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সমস্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে লেখককে ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে সেদেশে পাঠানো হয়। শ্যামলাল মিত্রের 'মিশরযাত্রী বাঙালী' বইটি পড়তে রোমাঞ্চকর কাহিনীর মতো লাগে কারণ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মিশর-অভিযানে অংশগ্রহণকারী বাঙালী সৈনিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এতে আছে। বইটির প্রকাশক ভূমিকায় লিখছেন, "বাঙ্গালাভাষায় এরূপ ধরণের পুস্তক এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের লেখক ভিন্ন কোনও বাঙ্গালী এ পর্যন্ত সমুদ্রপার হইয়া দূরদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন নাই।"

গ্রন্থপঞ্জীতে মোট আটখানি বই আছে মিশর সম্বন্ধে। তার মধ্যে ছ-খানি মিশরের ইতিহাস বিষয়ে আর দু-খানি ভ্রমণ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ। এ ছাড়া গত শতাব্দীর শেষে বুয়র যুদ্ধের সময় দু-খানি এবং ১৯৩৫ সালে শুরু ইতালো-ইথিওপীয় যুদ্ধের সময় দু-খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেগুলিও আমরা তালিকাভুক্ত করেছি।

তালিকায় আরও কিছু নাম দেওয়া যেত : রোমহর্ষক শিশুপাঠ্য দুঃসাহসী কাহিনীর। কিন্তু এইসব কাহিনীর বাস্তব ভিত্তির একান্ত অভাব এবং আফ্রিকা-চর্চায় এদের প্রয়োজনও বিশেষ নেই। বরং শিশুদের গ্রহিষ্ণু মনে নানা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে এরা বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান বিস্তারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সর্বোপরি, পূর্বোক্ত তালিকায় দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর ও ইথিওপিয়া সম্বন্ধে পুস্তকের বিপুল সংখ্যাধিক্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ স্বাভাবিক। মিশরে বিকশিত হয়েছে পৃথিবীর

প্রাচীনতম সভ্যতা। তাই সেদেশকে বাদ দিয়ে মানুষের বিবর্তনের গতি বোঝা যায় না। আর ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইথিওপিয়ায় ইতালীর বর্বরোচিত আক্রমণের তরঙ্গ যে বাঙলার মননশীল মহলে এসে লাগে তার প্রমাণ ঊর্ধ্বোল্লিখিত বই দুটি। কিন্তু এই দেশ তিনটি বাদে পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় যে বিরাট ভূখণ্ড পড়ে রয়েছে, যার আয়তন ভারতবর্ষের কয়েক গুণ, তার সম্বন্ধে পুস্তকের একান্ত অভাব।

জেমস প্রিনসেপ প্রণীত ও স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক ১৮৩০ সালে প্রকাশিত 'প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়'-এর প্রথম পরিচ্ছেদে মিশরীয়দের সম্বন্ধে আলোচনাটিই বোধহয় বাংলাভাষায় আফ্রিকা সম্পর্কে প্রথম রচনা। আসলে এটি ইংরাজিভাষায় রচিত এবং এর বঙ্গানুবাদ করেন হিন্দু কলেজের তরুণ কর্মীরা ও চুঁচুড়ার পিয়ার্সন সাহেব। এদেশের ছাত্রদের জন্য রচিত, তাই মিশরের ভৌগোলিক বর্ণনা, অধিবাসীদের রীতিনীতি ও আচারব্যবহার, ধর্ম, সমাজ এবং ইতিহাসের সঙ্গে আছে প্রতি অধ্যায়ের বক্তব্যের ওপর সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী। আর আছে ছাত্রদের নৈতিক মান উন্নত করার জন্য প্রতি অধ্যায় থেকে গ্রহণযোগ্য উপদেশ। কয়েকটি উপদেশের নমুনা :

"লিপি বিদ্যাবিষয়ে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করা আমাদের উচিত, কি জন্যে না, তাহাতে পূর্ব বৃত্তান্ত সমস্ত আমরা জানিতে পারিতেছি; আর ছাপা বিদ্যাতে ও কৃতার্থ হইয়া তাঁহার প্রশংসা করা কর্তব্য, কারণ তাহাতে ঐ সকল ইতিহাস পুস্তক আমরা প্রত্যেক জন অল্পমূল্যে পাইতেছি।" [পৃষ্ঠা ৬৫]

মিশরীয় সভ্যতার মহৎ কীর্তির ধ্বংসের প্রতি তরুণ ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখক বলছেন :

"দেখ, যাহারা ঐ ২ নগরের পত্তন করিয়াছিল, এবং যতলোক সেই ২ স্থানে বাস করিয়াছিল, তাহারা সকলেই পঞ্চত্ব পাইয়াছে; তদ্রূপ অল্প দিবসের পর আমাদের এই মাটির দেহ মাটিতে মিশাইয়া যাইবে; অতএব লোকান্তরে গমন করিতে প্রস্তুত থাকা আমাদের কর্তব্য কি না।" [পৃষ্ঠা ৬৫]

অন্যত্র :

"বিচারকর্তাকে নিযুক্ত করিবার বিষয়ে যে কতকগুলি কথা লেখা গিয়াছে, তাহাতে এই বোধ হয়, যে মিশর দেশের লোকেরা রাজ্যের ন্যায় বিচার করা ও

সত্যকথা কহা যে কেমন উচিত কর্ম তাহা জানিত; ইহাতে এই বড় খেদের বিষয়, যে এতদ্দেশে (বঙ্গদেশে) প্রায় সকলেই বাল্যাকালাবধি মিথ্যাবাক্য কহিয়া কালযাপন করে।" [পৃষ্ঠা ৬৯]

সে যুগের মানদণ্ডে 'প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়'-এর আলোচনা হয়তো নিম্নস্তরের নয়। কিন্তু তার সত্তর বছর পরে প্রকাশিত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'সচিত্র বুয়র ইতিহাস'-এ যুক্তিহীন, অর্থহীন, অপ্রাসঙ্গিক অর্ধসত্যের ভিড়। এর অযৌক্তিকতার কিছু নিদর্শন এখানে উপস্থিত করা যাক।

বুয়রদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে লেখকদ্বয় বলছেন: বুয়রদের "শয়ন করিবারও কিছুমাত্র স্থান নির্ণয় নাই, যাঁহার যে স্থানে ইচ্ছা, তিনি সেই স্থানেই মেজের ওপর পড়িয়া থাকেন।……একবার ইহারা যে বস্ত্র পরিধান করেন, তাহা মাসাবধির মধ্যে প্রায়ই আর পরিবর্তন করেন না।" [পৃষ্ঠা ১৪৭]

'সচিত্র বুয়র ইতিহাস'-এর ঐতিহাসিক গবেষণার নিদর্শনস্বরূপ অন্য একটি উল্লেখ্য অনুচ্ছেদ :

"বুয়রদের বিশেষত বুয়র স্ত্রীলোকদিগের একটু বেশ 'হাতটান' রোগ আছে।……স্ত্রীলোকগণ দোকান হইতে কোনো দ্রব্য ক্রয় করিবার সময় প্রায়ই কিছু না কিছু দোকানদারগণের বিনানুমতিতে আপন আপন পকেটে রাখিতে ত্রুটি করেন না। দোকানদারগুলিও প্রায় অতিশয় চতুর হয়; কি কি দ্রব্য বুয়র রমণীগণ অপহরণ করিতেছেন দোকানদারগণ তাহার দিকে বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখে। কিন্তু কিছু না বলিয়া রমণী যে দ্রব্য খরিদ করেন, তাহার বিলের সহিত অপহৃত দ্রব্যগুলিরও মূল্য লিখিয়া দেয়; বুয়র রমণীও আর কোনো কথা বলিতে সাহস না করিয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে অপহৃত দ্রব্যগুলিরও মূল্য প্রদান করিয়া থাকেন।" [পৃষ্ঠা ১৫৩]

এমন ইতিহাস চর্চায় মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বাংলাভাষায় যে আফ্রিকা সম্বন্ধে তথ্যমূলক ও যুক্তিনিষ্ঠ গ্রন্থ একেবারে রচিত হয় নি তা নয়। কালীপ্রসন্ন দত্ত লিখিত 'বুয়র যুদ্ধ' একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এর আলোচ্য বিষয় দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস। লেখকের অবশ্য বুয়র-বৃটন দ্বন্দ্বে খানিকটা বৃটিশপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা আছে। তা সত্ত্বেও এটি স্থূল প্রচারধর্মী হয়ে ওঠে নি। বরং স্বীয় মতের সমর্থনে লেখক তথ্যপ্রমাণ দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য অঙ্ক

হলো বুয়র যুদ্ধের ঘটনা। তাছাড়া, পরিশিষ্টে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দলিল সন্নিবিষ্ট হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : স্যাণ্ড নদী কনভেনশন (১৮৫২), প্রিটোরিয়া কনভেনশন (১৮৮১) এবং বাংলা ১৩০৯ সালের ২৯শে জ্যৈষ্ঠের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ 'বুয়ার নীতি'।

পূর্বোক্ত তালিকা থেকে আমরা একথাও বুঝতে পারি যে বাংলায় আফ্রিকা-চর্চা অবিচ্ছিন্ন ধারায় হয় নি। লণ্ডনের ইণ্টারন্যাশনাল আফ্রিকান ইন্সটিট্যুট ও রয়্যাল এম্পায়্যার সোসাইটি কিংবা পারীর ম্যুসে দ্য লম্-এর মতো কোনো প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে নেই। যেটুকু কাজ হয়েছে, তার কৃতিত্ব তথা দায়িত্ব ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার এবং তার প্রগতি স্বভাবতই সবিরাম ও অনিয়মিত হতে বাধ্য। আফ্রিকা মহাদেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও সমস্যা উল্লিখিত গ্রন্থাবলীর প্রায় অধিকাংশের প্রেরণা যুগিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের ধনসমস্যা ও ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের শোচনীয় অবস্থাকে কেন্দ্র করে তিনটি বই লেখা হয়েছে। ইঙ্গ-বুয়র যুদ্ধ দুটি, ১৮৮২ সালের বৃটিশবাহিনীর মিশর-অভিযান একটি এবং ইতালো-ইথিওপীয় যুদ্ধ দুটি পুস্তকের বিষয়বস্তু। রামনাথ বিশ্বাসের একটি ভ্রমণ-কাহিনী কেনিয়ার 'মাউ মাউ' বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত। শ্রীচাণক্য সেনের 'ধীরে বহে নীল' মিশরীয় জাতীয়তাবাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আরবজগতে বৃটিশপ্রভুত্ব অবক্ষয়ের কাহিনী।

উল্লিখিত রচনাবলীতে রাজনীতি ও ইতিহাসের সংখ্যাগরিষ্ঠতাও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ ছাড়া, বাকি সবগুলিই প্রায় পূর্বোক্ত পর্যায়ের। অর্থাৎ ভাষান্তরে আফ্রিকার ভূগোল, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বাংলাভাষায় কোনো আলোচনা হয় নি বললেই চলে। আর আফ্রিকা দূরে থাক, ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশ সম্বন্ধে এ ধরনের আলোচনা বাংলাভাষায় কতই বা হয়েছে!

চার

এতক্ষণ বাংলাভাষায় আফ্রিকা-চর্চার কথা বলা হল। এবার বাংলাদেশে আফ্রিকা-চর্চার প্রসঙ্গে আসা যাক। যে কারণে বাংলাভাষায় আফ্রিকা-চর্চার সুযোগ সীমিত, কিছুটা সেই কারণে বাংলাদেশে আফ্রিকা সম্পর্কে পঠন-পাঠন ও গবেষণা অনগ্রসর। অবশ্য উত্তর আফ্রিকার মুসলমান-প্রধান

আরব দেশগুলি (বিশেষ করে মিশর) ঐস্লামিক কিংবা আরব-ইতিহাসের প্রতি আমাদের কিছুটা মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। তেমনি কমনওয়েলথের ইতিহাসের কল্যাণে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন সম্পর্কে নাতিগভীর জ্ঞান আমরা রাখি। কিন্তু তথাকথিত 'নিগ্রো' আফ্রিকার মানুষ ও তার সমস্যা নিয়ে আলোচনা বা চর্চা বিশেষ হয় নি বা হয় না বললেই চলে। ইদানিংকালে অবশ্য কেউ কেউ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও অনুসন্ধিৎসায় আফ্রিকা সম্বন্ধে ইংরাজিতে গ্রন্থরচনা করেছেন কিংবা প্রবন্ধ লিখেছেন। তার মধ্যে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'আফ্রিকানিজম্' বইটি উল্লেখযোগ্য। যোগাযোগের অভাবই বোধহয় এই ব্যর্থতার একমাত্র কারণ নয়। বাংলা-দেশের সঙ্গে জাপানের কী বা যোগাযোগ? অথচ 'দূর প্রাচ্য' বা 'পূর্ব এশিয়া' কলকাতা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হয়ে থাকে। যোগাযোগ ছাড়া তাই আঞ্চলিক গুরুত্বও উল্লেখনীয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একদিন আফ্রিকার ভূমিকা ছিল অকিঞ্চিৎকর। তাই তার পঠন-পাঠনে এত কার্পণ্য। অবশ্য ভারতের বিদেশী শাসকদের কাছে আফ্রিকা সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য তত্ত্বের প্রয়োজন যে একেবারে ছিল না তা নয়। কিন্তু তার জন্য তো লণ্ডনে রয়েছে ইণ্টারন্যাশনাল আফ্রিকান ইন্সটিট্যুট, রয়্যাল এম্পায়্যার সোসাইটি এবং কলোনিয়াল অফিস।

পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক ভারসাম্যের প্রতিফলন পাওয়া গেল ১৯৫৭ সালে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিভাগে 'বর্তমান আফ্রিকা' নামক একটি ঐচ্ছিক বিষয় প্রবর্তনে। দুঃখের বিষয়, তিন বছর বাদে এই পাঠ্যক্রম উঠিয়ে দেওয়া হয়। অধুনা, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডিপার্টমেণ্ট অফ আফ্রিকান স্টাডিজ' ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষে আর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে আফ্রিকা-তত্ত্বের পঠন-পাঠন ও গবেষণা চলছে বলে মনে হয় না।

অথচ, আফ্রিকার সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে। তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বাড়তির পথে। শ্রীনেহরু যে 'শান্তি এলাকা'র কথা বলেন আফ্রিকায় তার সম্প্রসারণের প্রচুর সুযোগ বর্তমান। এ ছাড়া পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রায় দশলক্ষ ভারতীয় বংশোদ্ভুত আফ্রিকাবাসীদের কথা ভুললে চলবে না। একে একে এই সব দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ভারতীয় বাসিন্দাদের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছে। এক কথায়, আজ না হোক কাল আফ্রিকাচর্চা করেছে এমন বহু লোকের প্রয়োজন আমাদের হবে। ভবিষ্যতের এ-দায়িত্ব পালনের প্রস্তুতি আজ থেকেই করা উচিত।

কিন্তু তার আয়োজন কোথায়?

আকাশ মাটি ও সূর্য

শঙ্কর চক্রবর্তী

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঐদিন একটি কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্পুৎনিক তিন স্তরবিশিষ্ট এক রকেটের মাথায় চাপিয়ে সর্বপ্রথম মহাকাশে পাঠালেন রুশ বিজ্ঞানীরা। তারপর রাশিয়া ও আমেরিকা—দুই দেশের বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় আরো বহু স্পুৎনিক মহাকাশে উঠেছে, মহাকাশযাত্রী মানুষেরা বারকয়েক পৃথিবী পরিক্রমা করে নিরাপদে আবার পৃথিবীর মাটিতে ফিরে এসেছেন।

গোড়ার কথা

এই বৃহৎ ঘটনাপঞ্জীর আগেও রকেটেরা হানা দিচ্ছিল—তবে নিতান্তই বায়ুমণ্ডলের এলাকায়। কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে ওপরে ওঠা ও নামার সময় বায়ুর ঘনস্তরের সঙ্গে ঘর্ষণে জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ হওয়া—এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এই প্রাথমিক রকেটগুলোর জীবন। তারই ফাঁকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির কলকাঠির নাড়াচাড়ায় ওপর আকাশের বায়ুর ঘনত্ব, চাপ, গঠন ও সূর্যদেহজাত রশ্মির প্রাথমিক চরিত্র সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য সংগৃহীত হত, বেতার-ঢেউয়ের মাধ্যমে তারা এসে পৌছত বিজ্ঞানীদের গবেষণামন্দিরে।

এরকম ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানীরা খুশি হচ্ছিলেন না। অনেক বড়ো প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজও তাঁদের জানা হয় নি। যেমন, পৃথিবীর জলবায়ু সত্যি সত্যি বদলাচ্ছে কি? সূর্যের আলো ও তেজ পৃথিবীর বাতাস ও সমুদ্র কিভাবে ভাগ করে নেয় নিজেদের মধ্যে? মেরুঅঞ্চলের জমাটবাঁধা বরফের স্তূপ গলতে কি পারে কোনোদিন? বরফাবৃত কুমেরু মহাদেশ বা অ্যাণ্টার্কটিকা পৃথিবীর আবহাওয়াকে প্রভাবিত করছে কি? সামুদ্রিক ঝড়ঝঞ্ঝা উপকূলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগেই খবরটা জানা যায় কিভাবে? পৃথিবীর সব অঞ্চলের আবহাওয়ার খবর আগে থেকেই

বলে দেওয়া কি সম্ভব নয়? মহাকাশের গহন অভ্যন্তর থেকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় যে মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌছচ্ছে, কোথা থেকে আসে তারা? অতিতনু ঊর্ধ্বাকাশে আয়নমণ্ডল গড়ে ওঠার পেছনে কী রহস্য লুকিয়ে আছে? মহাদেশগুলো কি আসলে মহাসাগরের বুকে ভেসে বেড়ায়? পৃথিবী কি সূর্যের করোনা (corona) বা আবহমণ্ডলের জালে বাঁধা পড়ে আছে? অ্যাণ্টার্কণ্টিকা সত্যিই কি একটি মহাদেশ না বরফাবৃত কতকগুলো দ্বীপের সমষ্টি?

বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সঠিকভাবে পৃথিবীর জল, মাটি ও আকাশের এলাকা সম্বন্ধে অতি অল্প খবরই আমরা আয়ত্ত করতে পেরেছি। অসীম মহাকাশের বুকে কি এক অজানা রহস্যের রোমাঞ্চ—তার বৈজ্ঞানিক ছবিটি কতটুকু উদ্ঘাটিত হয়েছে আমাদের কাছে?

এ যেন বিরাট এক নাটমঞ্চ জুড়ে অগণিত ঘটনার সমাবেশ, আর পৃথিবীর মানুষ অবাকবিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তারই দু-একটা টুকরো ছবি দেখে চলে। সে অল্প দেখায় তার তৃপ্তি নেই। মহাকাশের প্রাণঘাতী রশ্মির যাত্রাপথে বায়ুমণ্ডল এক রক্ষীদুর্গের মতো দাঁড়িয়ে আছে—যাদের সরাসরি সংঘাতে সমগ্র প্রাণীজগৎ মৃত্যুর শিকারে পরিণত হতো। কিন্তু বায়ুর তলায় পরমনিশ্চিন্ত আরামের যে কালযাপন, সে যেন ঘরবন্দী জীবন। যেখানে বসে ঘরের বাইরের জীবনের সঙ্গে ঘরের সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টায় বড়ো কিছু সম্ভাবনা নেই। জানালাটা তার বড়ো ছোট, বাইরের খবর বেশি পৌছায় না। তার জন্যে প্রয়োজন ঘরের ছাদরূপী এই আকাশটার বাইরে গিয়ে মহাকাশের পটভূমিতে ঘর বা পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করা। আর সে সন্ধানেই মিলবে মুক্তো।

আ-ভূ-বর্ষ

মাতা পৃথিবীকে ব্যাপকভাবে দেখার এক বিরাট দৃষ্টি সর্বপ্রথম উন্মুক্ত করে দিল এই স্পুৎনিকেরা। কিন্তু মহাকাশের বুকে এই যে প্রাথমিক জয়যাত্রা—তা কিন্তু বিজ্ঞানীদের একটা বিচ্ছিন্ন কার্যসূচী নয়। এ ছিল পৃথিবীব্যাপী এক বিরাট বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার অঙ্গস্বরূপ, যার নাম আন্তর্জাতিক ভূপদার্থবিজ্ঞান বর্ষ (International Geophysical Year),

সংক্ষেপে আ-ভূ-বর্ষ। ১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৯৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর—মোট এই আঠারো মাসব্যাপী ছিল আ-ভূ-বর্ষের কার্যকাল। পৃথিবীর ৬৭টি দেশের দশ হাজারের বেশি বৈজ্ঞানিক এই পরিকল্পনাকে রূপদান করার জন্যে কাজে নেমেছিলেন। এ উপলক্ষে সারা পৃথিবী জুড়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার তৈরি হয়েছিল দু হাজারের বেশি।

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবী সম্বন্ধে অজানা প্রশ্নগুলোর সমাধানের একটা চেষ্টা এবং পুরনো জ্ঞান ও তথ্যগুলোর সংস্কারের মধ্যে দিয়ে এই পৃথিবীর সূর্য ও মহাকাশকে ভালো করে জানা। শুধু পৃথিবীকে জানার বিষয়বস্তুগুলোই এত বড়ো যে একটি দেশের মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টায় সে কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। তার জন্যে প্রয়োজন সারা পৃথিবীর মহাদেশ, মহাসাগর ও বরফের এলাকা জুড়ে অগণিত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠা এবং সমস্ত লব্ধ তথ্যকে একটি কেন্দ্রীয় গবেষণামন্দিরে পাঠানো। সেখানে তাদের বিশ্লেষণ চলবে দীর্ঘদিন ধরে। আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ছাড়া এতবড়ো কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে না।

রাজনৈতিক স্নায়ুযুদ্ধের মধ্যেও যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা এরকম একটি ব্যাপক পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্যে সচেষ্ট হয়েছিলেন, পৃথিবীর মানুষ হিসেবে এজন্যে আমরা সবাই গর্ব অনুভব করি।

সুষ্ঠুভাবে রূপ দেবার জন্যে সমগ্র পরিকল্পনাকে তেরোটি গবেষণাক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছিল। তাদের নাম হলো :

১ Glaciology [হিমবাহ ও বরফবিজ্ঞান]
২ Oceanography [সমুদ্রবিজ্ঞান]
৩ Meteorology [আবহবিজ্ঞান]
৪ Solar activity [সৌরদেহের ক্রিয়াপ্রক্রিয়া]
৫ Aurora and Airglow [মেরুজ্যোতি ও নৈশাকাশদীপ্তি]
৬ Cosmic Rays [মহাজাগতিক রশ্মি]
৭ Ionospheric Physics [আয়নমণ্ডলসংক্রান্ত পদার্থবিজ্ঞান]
৮ Geomagnetion [ভূ-চৌম্বকতত্ত্ব]
৯ Gravity [মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব]
১০ Seismology [ভূকম্পনতত্ত্ব]

১১ Redioactivity Studies [তেজস্ক্রিয়তাসংক্রান্ত গবেষণা]
১২ Latitudes, Longitudes and Measurements of the Earth [অক্ষরেখা, দ্রাঘিমারেখা ও পৃথিবীর বিভিন্ন পরিমাপ-সংক্রান্ত গবেষণা]
১৩ Rocket and Satellite Exploration of the Upper Atmosphere [রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে ঊর্ধ্বাকাশ-সংক্রান্ত গবেষণা]

বিরাট পটভূমি জুড়ে এতবড়ো তথ্যসংগ্রহপর্ব পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে কখনো ঘটে নি। সমগ্র ঘটনাচক্রের নায়ক হলেন সূর্যদেব। পৃথিবীর প্রতিটি প্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গেই সূর্যদেবের বিভিন্ন ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার একটা নিগূঢ় যোগাযোগ বহুদিন ধরেই বিজ্ঞানীদের নজরে পড়ছিল। প্রতি এগারো বছর অন্তর অন্তর বিশেষ করে দেখা যেত, পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রটা হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে পরিবর্তনশীল আর গোলমেলে হতে চাইছে। মেরুঅঞ্চলে চলাচলকারী জাহাজ আর বিমানের কম্পাসের কাঁটা অনড় হয়ে পড়ছে—ফলে দিগ্‌নির্ণয়ের স্থিরতা হারিয়ে নৌ-বিমান চলাচলব্যবস্থা বিপদসঙ্কুল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। হারিকেন আর সাইক্লোন সৃষ্টি হচ্ছে মহাসাগরের বুকে ও প্রচণ্ড ধ্বংস আর মৃত্যুর রূপে এসে আছড়ে পড়ছে মাটির ওপরে। পৃথিবীর এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশ পর্যন্ত বেতার-ঢেউয়ের আদানপ্রদান ব্যবস্থা মাঝপথে কোথায় যেন তার ঠিকানাকে হারিয়ে বসে আছে। আরো ছোটবড়ো নানা পরিবর্তন সম্বন্ধে অনুসন্ধানরত বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন, সকলের কার্যকারণের মূলে রয়েছে সৌরকলঙ্ক (sunspots)—সৌরদেহের একটি ঘটনা। এ প্রসঙ্গে সূর্যের অন্দরমহলের খানিকটা পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে।

সূর্য

সূর্যদেহকে মোটামুটি তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। একটি রঙীন কাঁচের মধ্যে দিয়ে সূর্যের দিকে তাকালে যে নির্দিষ্ট গোলকটি চোখে পড়ে—সেটি প্রথম স্তর, নাম ফোটোস্ফিয়ার বা আলোকমণ্ডল। সূর্যের যাবতীয় তেজ আর আলোর সৃষ্টি এখানেই। এই মণ্ডলের উপরিভাগে মাঝে মাঝে জেগে ওঠে কালো কালো কতকগুলো জায়গা—সৌরকলঙ্ক। ওরা

কোনো গর্ত নয়। ওদের তাপমাত্রা ৫৫০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর ওদের আশেপাশের অন্য জায়গার তাপমাত্রা হলো ৬০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তাপমাত্রার এই স্বল্প তারতম্যের জন্যেই ওদের কালো দেখায়। সূর্যের কেন্দ্রের তাপ অবশ্য চার কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এক একটি সৌরকলঙ্ক আয়তনে এতবড়ো হয় যে প্রায় একশো পৃথিবীকে স্বচ্ছন্দে পুরে ফেলা যায় তার মধ্যে। ওদের সৃষ্টির কার্যকারণ নিয়ে তর্কের শেষ আজো হয় নি। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, আলোমণ্ডলের আভ্যন্তরীণ চৌম্বক-ক্ষেত্রজাত বিরাট কোনো আলোড়নের ওরা হলো বহিঃপ্রকাশ। সৌরকলঙ্কের চারপাশের তড়িৎচৌম্বকীয় পরিবর্তন প্রভাব বিস্তার করে সূর্যের দ্বিতীয় স্তরে, যার নাম ক্রোমোস্ফিয়ার। সেখানকার তাপ, বৈদ্যুতীকরণ ও আন্দোলন বেড়ে ওঠে। সৃষ্টি হয় সৌরস্ফীতি (Solar Flares) ও সৌরোৎক্ষেপ (Solar Prominences)। তারই সঙ্গে সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল গতি নিয়ে জন্মাল বেগুনীপারের আলো, মহাজাগতিক রশ্মি ও তুলনায় অনেক কম গতিযুক্ত সৌরকণিকা। জীবদেহের ক্ষেত্রে এদের প্রত্যেকটির প্রভাব প্রাণঘাতী। এই রশ্মি ও কণিকার কিছু অংশ ছুটে আসে পৃথিবীর দিকে আর কিছু অংশ প্রবেশ করে সূর্যের তৃতীয় স্তর—করোনা বা কিরীটিকার মধ্যে। সূর্যের আবহমণ্ডল যেন এটি। একটি পাতলা চাদরের মতো মহাকাশে কোটি কোটি মাইল জুড়ে ছড়িয়ে আছে। বিজ্ঞানীদের অনুমান, পৃথিবীবাসীও নাকি করোনার প্রভাবিত এলাকার মধ্যেই। এখানে সৃষ্টি হয় মারাত্মক একজাতের রঞ্জনরশ্মি—যার কিছু অংশ এসে পৌঁছয় পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলের ওপর। এই বিভিন্ন রশ্মি ও কণিকার সংঘাতেই পৃথিবীর সর্বাঙ্গ জুড়ে নানা পরিবর্তনের খেলা শুরু হয়ে যায়, যাদের কথা খানিক আগেই বলা হয়েছে।

এইসব পরিবর্তনের মূলে রয়েছে যে সৌরকলঙ্ক, প্রতি এগারো বছর অন্তর সংখ্যা ও তীব্রতায় তারা বেড়ে ওঠে। এক ঢিলে দুই পাখি মারার জন্যে বিজ্ঞানীরা আ-ভূ-বর্ষের কার্যকালটা বেছে নিলেন এমন একটা সময়ে যখন জোরালো একটা Sunspot Cycle শুরু হয়েছে সূর্যের দেহে। এ অবস্থায় সৌরগবেষণায় অনেক নতুন খবর মিলতে পারে। একই সঙ্গে পৃথিবীবিজ্ঞানের সবগুলো শাখাতে গবেষণার নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়ে বসে আছে।

আ-ভূ-বর্ষের তেরোটি কার্যক্রমের মধ্যে তার ত্রয়োদশ অর্থাৎ মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্পুৎনিক স্থাপনার পরিকল্পনাটি ছিল সবচেয়ে চমকপ্রদ। অন্য বারোটি পর্বের নানা প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহে এই উড়ন্ত গবেষণাগারগুলো বিপুলভাবে কার্যকরী হয়েছে। আমরা ক্রমিকভাবে সে আলোচনা করব।

হিমবাহ ও বরফবিজ্ঞান

পৃথিবীর মোট আয়তনের দশভাগের প্রায় একভাগ জায়গা জুড়ে বরফের রাজত্ব—সুমেরু ও কুমেরু। আকারে কুমেরু সুমেরুর চেয়ে অনেক গুন বড়ো। কোনো কারণে যদি এই হিমরাজ্য গলে জল হয়ে বসে, পৃথিবীর সমস্ত মহাসাগরগুলোর পিঠ দুশো থেকে তিনশো ফুট উঁচু হয়ে উঠবে। মহাদেশের জমির ওপর দিয়ে সেই জল এগিয়ে যাবে ২৫০ থেকে ৩০০ মাইল। এ জাতীয় একটা ব্যাপার সত্যিই কি কখনো ঘটতে পারে? বিজ্ঞানীদের মতে ঘটা সম্ভব—যদি পৃথিবীর তাপ বেড়ে চলে ক্রমাগত। তাপবাড়ার মূলে রয়েছে প্রাণীজগৎ। নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাষ্প আমরা ত্যাগ করি, তার স্পর্শে বায়ু অনেকটা তপ্ত হয়। পৃথিবীর মাটি সেই তাপ অল্প পরিমাণে গ্রহণ করে। সূর্যের তেজ সরাসরিভাবে শোষণ করে পৃথিবীর উপরিভাগ নিজস্ব তাপ বিকীরণ করে লাল-উজানী (Infra-red) আলোর মাধ্যমে। তার. ফলেও বায়ুর তাপ খুব সামান্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এভাবে দেখা গেছে, গত একশো বছরে পৃথিবীর তাপ বেড়েছে গড়পড়তা দু ডিগ্রি ফারেনহাইট। আর এই বৃদ্ধির পালা নাকি শুরু হয়েছে গত হাজার বছর ধরে। এই মাত্রায় বেড়ে চললে দেড় দু হাজার বছর বাদে ঐ রকম একটা জলপ্লাবন ঘটলেও ঘটতে পারে। তাই পৃথিবী কতটা নিজস্ব তাপ বিকীরণ করছে, সেটা জানা দরকার আর সে খবরদারীর ভার দেওয়া হয়েছিল স্পুৎনিকের কিছু কিছু আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতির হাতে।

আ-ভূ-বর্ষের কার্যকাল শেষ হবার পর জানা গেল, আগের হিসেবের তুলনায় শতকরা ৪০ ভাগ বেশি বরফ পৃথিবীর মেরুঅঞ্চলে জমা হয়ে আছে। দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের বিরাট বরফের স্তূপ পৃথিবীর আবহাওয়াকে কতটা প্রভাবিত করছে, এ ছিল একটা প্রশ্ন। কিছু তথ্য এ-প্রসঙ্গেও পাওয়া

গেছে। রুশবিজ্ঞানীরা সূর্যদেহের ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সুমেরু ও কুমেরু অঞ্চলের জলবায়ু ও আবহাওয়া পরিবর্তনের একটা নিবিড় যোগাযোগ আবিষ্কার করতে পেরেছেন।

সমুদ্রবিজ্ঞান

পৃথিবীর প্রায় ৭০ ভাগ জুড়ে জলের রাজত্ব। অথচ আশ্চর্য কথাটা হল এই, চাঁদের জমির খুঁটিনাটি আমরা যতোটা ভালো করে জানি, পৃথিবীর মহাসাগরগুলোর তলদেশ সম্বন্ধে জানি সে তুলনায় অনেক কম।

সামুদ্রিক স্রোত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়াকে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। ইংলণ্ড ও নরওয়ের তাপমাত্রা স্বাভাবিকভাবে আবো পনের কি পঁচিশ ডিগ্রী কম হবার কথা। একমাত্র উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবেই ওই দুটো দেশ ঠাণ্ডায় জমে বরফ হবার পরিণতি থেকে রক্ষা পেয়েছে।

এই সমুদ্রস্রোতগুলোর সৃষ্টি হয় কিভাবে, তার পুরো খবর বিজ্ঞানীরা আজো লাভ করে উঠতে পারেন নি। সূর্যের তাপে সমুদ্রের বিভিন্ন স্তর বিভিন্নভাবে তপ্ত হয়। স্রোতের মাধ্যমে সেই তাপ এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশের উপকূল পর্যন্ত ছড়িয়ে চলে। ফলে পৃথিবীর জলবায়ুতে একটা সমতা রক্ষিত হয়।

মহাসাগরের গর্ভে আছে অগণিত পর্বতশ্রেণী, উচ্চতায় কেউ কেউ এভারেস্টকেও হার মানাতে পারে। তাদের মাঝে আবার কোথাও কোথাও রয়েছে বিরাট গভীর গর্ত বা ফাটলের মতো কতগুলো জায়গা। বেশির ভাগ ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের উৎস হল এরা। এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য বিজ্ঞানীরা খুঁজে চলেছেন। ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রের জল ফুলে ফেঁপে বিরাট আকার ধারণ করে। এদের বলে সুনামি (Tsunami)। প্রচণ্ড শক্তিতে উপকূলের ওপর গিয়ে এরা ঝাঁপিয়ে পড়ে ধ্বংসের মারমূর্তি নিয়ে। আগে থেকে এদের গতিবিধির খবর পাওয়া গেলে অনেক প্রাণহানি ও ক্ষতি এড়ানো যায়। এ ব্যাপারে স্পুৎনিকের আভ্যন্তরীণ কোনো ক্যামেরা যন্ত্র সামুদ্রিক বিপর্যয়ের যে কোনো দৃশ্যের ছবি তুলে বেতারে বিজ্ঞানীদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারে। সাবধান হবার যথেষ্ট অবকাশ তখন থাকবে।

সমুদ্র থেকে প্রতি বছর তিন কোটি টন মাছ খাদ্য হিসেবে ধরা হয়।

মহাসমুদ্রের বিশাল বক্ষে মাছেদের গতিবিধি সম্বন্ধে সঠিক খবর পাবার জন্যে বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থা স্পুৎনিকে স্থাপন করা সম্ভব।

আ-ভূ-বর্ষের কার্যক্রম অনুসারে সমুদ্রবিজ্ঞানে গবেষণারত রাশিয়ান জাহাজ 'ভিতিয়াজ' ১৯৫৭ সালে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে Marianas Trench নামে একটি স্থানে সমুদ্রের সর্বগভীর অংশের সন্ধান পায়। জায়গাটার গভীরতা ছিল প্রায় সাত মাইল। অত গভীর অন্ধকার ও চাপযুক্ত প্রদেশেও রুশ বিজ্ঞানীরা নিম্নশ্রেণীর কিছু সামুদ্রিক প্রাণীর সন্ধান পেয়েছেন।

মহাসাগরের গর্ভের বিভিন্ন জায়গায় বিজ্ঞানীরা মূল্যবান খনিজ পদার্থ খুঁজে পেয়েছেন। মানুষ একদিন তাকে কাজে লাগাবে, সন্দেহ নেই। প্রচুর উদ্ভিজ্জের সন্ধানও পাওয়া গেছে, খাদ্যপ্রাণে যারা খুবই সমৃদ্ধ। পৃথিবীর খাদ্য সমস্যার সমাধানে এরা একদিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

আবহবিজ্ঞান

বায়ুমণ্ডলের একেবারে নিচুতলাটার নাম হল ট্রপোস্ফিয়ার। আবহাওয়ার কারখানা বাড়িটা এখানেই। সূর্যের সঙ্গে আবহাওয়ার এক নিবিড় সম্পর্ক। সূর্যের তাপে সাগরের জল বাষ্প হয়ে হয় মেঘের সৃষ্টি। ঠাণ্ডা আর গরম বায়ুস্রোত একঠাঁই হলে তৈরি হয় ঝোড়ো হাওয়া। সে হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে আসে মেঘ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। নেমে আসে ঝড়জল। নিরবধি কাল ধরে বায়ুমণ্ডলের মাঝে ঠিক এমনি ধারার ব্যাপার ঘটে চলেছে। কিন্তু সেই ঘটনার ক্ষেত্র এত বিরাট যে তার সব কার্যকারণের পুরো হিসেব সব সময়ে পৃথিবী থেকে পাওয়া যায় না। যার জন্যে আবহাওয়াবিদেরা প্রায়ই নাকাল হন।

এ বিষয়ে তথ্যসংগ্রহের কাজে স্পুৎনিক হবে বিজ্ঞানীদের পরম সহায়। একটি স্পুৎনিক প্রতি দেড় ঘণ্টায় সমগ্র পৃথিবীকে একবার 'প্রদক্ষিণ' করে চলেছে। কাজেই পৃথিবীর সমগ্র অঞ্চলের কোথায় আবহাওয়ার কি পরিবর্তন ঘটছে, তার ছবি ক্যামেরায় তুলে বেতারে মুহূর্তের মধ্যেই সে পাঠিয়ে দিতে পারবে। সূর্যদেহ নিঃসৃত বেগুনীপারের আলো ও সৌরকণিকার সঙ্গে বায়ুর সংঘাতে আবহাওয়ার মাঝে কি পরিবর্তন ঘটে, তার বিশদ ছবি বিজ্ঞানীরা পেতে চান। একটি স্পুৎনিকের পক্ষে কয়েক হাজার আবহাওয়া স্টেশনের তুলনায় অনেক বেশি নিখুঁত তথ্য যোগানো সম্ভব হবে। পৃথিবী থেকে

যতো দূরে তার কক্ষপথ তৈরি হবে, তার ক্যামেরার দৃষ্টি হবে ততো বেশি বিস্তৃত।

অ্যামেরিকান বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই 'ইকো' নামে একটি আবহাওয়া স্পুৎনিকের ভেতরে শক্তিশালী ক্যামেরা যন্ত্র বসিয়ে মহাকাশে পাঠিয়েছেন। সেই যন্ত্র পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার ওপর মেঘের ছবি তুলে পাঠাচ্ছে। ফলে দূরভবিষ্যতে আবহাওয়ার চেহারা কোথায় কিভাবে বদলাবে, অনেক পূর্বাহ্নেই তার খবর মিলছে। এভাবে অদূরভবিষ্যতে পৃথিবীর বিভিন্ন কক্ষপথ জুড়ে অগণিত স্পুৎনিকের দল এক আন্তর্জাতিক আবহাওয়াকেন্দ্রকে গড়ে তুলবে। প্রকৃতির এক রহস্যপুরীর চাবিকাটি তখন পুরোপুরিই মানুষের করায়ত্ত হবে।

সৌরবিজ্ঞান

আ-ভূ-বর্ষের প্রধান নায়ক হলেন সূর্য। কারণ পরিকল্পনার প্রতিটি কার্যক্রমের পেছনেই তার সরাসরি হস্তক্ষেপের বহু সাক্ষ্য বিদ্যমান। সূর্যের অন্দর মহলের ঘটনাগুলোও কম নাটকীয় নয়। আর সেই রূপে তাকে ভালো করে দেখার এমন অপরূপ সুযোগ আবার এগারো বছরের আগে পাওয়া যাবে না। সৌরকলঙ্কসমেত সৌরদেহের প্রতিটি ঘটনার রোজনামচা রেখেছেন পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা আ-ভূ-বর্ষের পুরো দেড়টি বছর জুড়ে। সূর্য সব সময়ে তাঁদের কড়া নজরবন্দী ছিল। যখনই কোনো সৌরোৎক্ষেপ বা সৌরস্ফীতি সৃষ্টি হচ্ছিল, অমনি তাঁরা পৃথিবীর কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে যন্ত্রপাতিসহ রকেট ছুঁড়ছিলেন। যাদের কাজ ছিল শুধু ওঠা আর নামা, কিন্তু সেই স্বল্প সময়ের মধ্যেই নির্দিষ্ট যন্ত্রপাতির সঙ্গে সৌরনিঃসৃত বিভিন্ন রশ্মির সংঘাতের ফলে, ঐসব রশ্মির প্রাথমিক চরিত্রের আনুপূর্বিক খবর পৃথিবীর গবেষণামন্দিরে পৌঁছোতে দেরি হচ্ছিল না।

পৃথিবীতে বসে যে সূর্যকে আমরা রোজ দেখি—সে তার খণ্ডিত রূপ। সাধারণ আলো আর তেজের মধ্য দিয়ে যেটুকু খবর আসে, সে যেন সহস্র সুরের মিশ্রিত ঐকতানের মাত্র একটা সুরের ঢেউ। আরো অগণিত তেজলহরী বায়ুসমুদ্রের বেড়াজাল পেরিয়ে মাটিতে পৌঁছনোর সার্টিফিকেট পায় না। রকেটের যন্ত্রের কাছ থেকে এদের যে খবর আমরা পেয়েছি তারই ভিত্তিতে প্রতিটি মহাকাশযানের অঙ্গসজ্জায় নিরাপত্তার বিধান করা সম্ভব হয়েছে। বেলকা, স্ত্রেলকা থেকে শুরু করে গাগারিন, তিতফ, গ্লেন,

কার্পেন্টার মহাকাশযাত্রীরা সবাই নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পেরেছেন।

মেরুজ্যোতি ও নৈশাকাশদীপ্তি

পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্র মহাকাশে আপন রশ্মিজালকে ছড়িয়ে রেখেছে। সৌরকণিকাস্রোতের যে দল পৃথিবীর দিকে নামতে শুরু করে, তারা সেই বেড়াজালে বন্দী হয়ে হাজির হয় মেরু অঞ্চলে। পৃথিবীর জমির ৫০ কি ৬০ মাইল দূরে এসে তারা যখন পৌঁছয়, তখন বায়ুর সেই অতিতনু অঞ্চলের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন কণিকাদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ফলে বাতাসের মধ্যে এক জলুনির সৃষ্টি হয়—স্নিগ্ধতায় ও রঙের বর্ণাঢ্যতায় যা অপরূপ সুন্দর। মেরুজ্যোতি কখনো কখনো পৃথিবীর ছ'শ মাইল দূরেও দেখা যায়। আ-ভূ-বর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় ছিল মেরুজ্যোতি কারণ সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও চৌম্বকক্ষেত্রের পারস্পরিক যোগাযোগ এমন নাটকীয়ভাবে বোধহয় আর কোনো ঘটনার মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পায় না। বিভিন্ন উচ্চতায় মেরুজ্যোতির আকৃতি ও রং দেখে সেই এলাকায় বায়ুর ঘনত্ব ও গঠনরূপের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

বায়ুমণ্ডল যদিও মোটামুটিভাবে ২৫০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত, তার শতকরা ৯৯ ভাগ রয়েছে প্রথম পনের মাইলের মধ্যেই। তারপর ক্রমে লঘু হতে হতে বায়ু ২৫০ মাইলের কোঠায় মিলিয়ে গেলেও, তার ছিটেফোঁটা হাজার মাইল দূরেও মিলতে পারে। কাজেই মেরু অঞ্চলের অক্ষরেখা বরাবর একটি স্পুৎনিকের কক্ষপথ রচনা করতে পারলে যন্ত্র মাধ্যমে উর্ধ্বাকাশে বায়ুর ঘনত্ব সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য লাভ করা সম্ভব হবে।

বিশেষ যন্ত্রের ভেতর দিয়ে রাতের কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞানীরা এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখতে পেলেন। বাতাস যেন সব সময়ে কাঁপছে আর ছড়াচ্ছে এক দীপ্তি, খোলা চোখে যাকে দেখা মোটেই সম্ভব নয়। অনেকে মনে করেন, কুকুর বেড়ালের চোখ বাতাসের এই সামান্য দীপ্তিতে স্পর্শকাতর বলে অন্ধকারের মধ্যেও তারা দেখতে পায়। এর সৃষ্টিরহস্য এখনো সঠিকভাবে জানা যায় নি।

দিনের বেলা সূর্যের তেজের সংঘাতে বাতাসের বিভিন্ন গ্যাসের অণুরা ভেঙে গিয়ে জন্ম দিচ্ছিল যে পরমাণুদের, তারাই আবার রাত্রিকালে একঠাঁই

হয়ে গড়ে তোলে পুরনো অণুদের। এই গড়ার কাজের সময়েই হয়তো দিনের বেলা জমানো চাপ ছড়িয়ে পরমাণুরা আকাশদীপ্তিকে তৈরি করে বসে।

মহাজাগতিক রশ্মি

মহাকাশের গহন অভ্যন্তরে জাত এই পরম রহস্যময় রশ্মিটির জন্মরহস্য নিয়ে তর্কের শেষ আজো হয় নি। মোটামুটিভাবে জানা গেছে, সূর্য থেকে সব সময়েই একজাতের অল্পশক্তিমান মহাজাগতিক রশ্মির সৃষ্টি হচ্ছে। Supernova হল একটি নক্ষত্রের জীবনে সেই পর্যায়, যখন তার মৃত্যুর পালা শুরু হয়েছে। আভ্যন্তরীণ চাপের বৈসাম্যের ফলে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ধাক্কায় সমস্ত নক্ষত্রটা যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবার এক অবস্থায় পৌঁছেছে এবং বিকীরিত তাপের পরিমাণও বেড়ে উঠছে সহস্রগুণ, লক্ষগুণ। এই জাতীয় নক্ষত্র থেকেই বেশির ভাগ মহাজাগতিক রশ্মির সৃষ্টি হচ্ছে বলে একদল বিজ্ঞানী অনুমান করেন। সূর্য অথবা মহাকাশের চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে পথ তৈরি করার সময় এই রশ্মির দল এক দুর্ধর্ষ শক্তিকে লাভ করে বসে।

পৃথিবীর পনের থেকে পঁয়ত্রিশ মাইলের মধ্যে এসে হাজির হলেই এই এই রশ্মিকণারা বায়ুর বিশেষ করে নাইট্রোজেন পরমাণুদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে এক একটি ছোটখাট পারমাণবিক বিস্ফোরণকে তৈরি করে। নাইট্রোজেন পরমাণু ভেঙে গিয়ে জন্ম দেয় একটি তেজস্ক্রিয় কার্বন কণা (কার্বন ১৪) ও একটি তেজস্ক্রিয় হাইড্রোজেন কণার (ট্রাইটিয়াম; এর পরমাণু কেন্দ্রীন একটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রনকে নিয়ে গড়ে উঠেছে)। ঝরণার আকারে এরপর এরা নামতে শুরু করে নিচের দিকে। এই দ্বিতীয় চরিত্রের মাধ্যমেই মহাজাগতিক রশ্মির সঙ্গে আমাদের পরিচয়—বায়ুর বাধার জন্যে এদের প্রাথমিক চরিত্র জানার সুযোগ পৃথিবী থেকে কখনোই ঘটে না। পৃথিবীর মাত্র উনিশ মাইল ওপরে এই রশ্মির তীব্রতা ভূপৃষ্ঠের তুলনায় আড়াই হাজার গুণ বেশি। মহাকাশের সে তীব্রতা আরো বহুগুণ। এই রশ্মির প্রাথমিক ও দ্বিতীয় চরিত্রের পরিমাপের জন্যে অতি সুষ্ঠু যান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্পুৎনিক সজ্জিত ছিল। যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, ভবিষ্যৎ মহাকাশ-যাত্রীদের নিরাপত্তা বিধানের জন্যে তা বিশেষভাবে কার্যকরী হবে। মহাকাশের সর্বশক্তিমান এই রশ্মিটির সরাসরি সামান্য সংঘাতে মানুষের বংশগতির ধারা পালটে যেতে পারে (Mutation)।

আয়নমণ্ডলবিজ্ঞান

পৃথিবীর পঁয়ত্রিশ থেকে আড়াই শ' মাইল দূর পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুর এই বৈদ্যুতিক স্তরটির অবস্থিতি আন্তর্মহাদেশীয় বেতারবার্তার আদানপ্রদান ব্যবস্থাকে সম্ভব করে তুলেছে। এর গঠনপর্বের মূলে রয়েছে সূর্যেরই ভূমিকা। সূর্যদেহ থেকে বেগুনীপারের আলো, রঞ্জনরশ্মি ও সৌরকণিকাস্রোত সব সময়েই ছাড়া পাচ্ছে। সৌরকলংকের সময় তারা তীব্রতায় ও পরিমাণে শুধু বেড়ে ওঠে। বায়ুর পরমতনু এলাকার পরমাণুরা এদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে আপন আপন পরিবার থেকে একটি দুটি করে ইলেকট্রনকে হারিয়ে বসে। (পরমাণুর কেন্দ্রীনে রয়েছে প্রোটন ও নিউট্রন। প্রথমটি ধনতড়িতাবিষ্ট, দ্বিতীয়টির কোন বিদ্যুৎধর্ম নেই। কেন্দ্রীনের চারপাশে এক বা একাধিক কক্ষপথে ঘুরপাক খায় ঋণতড়িৎযুক্ত এক বা একাধিক ইলেকট্রন। স্বাভাবিক অবস্থায় একটি পরমাণুর আভ্যন্তরীণ এই দুটি বিপরীত বিদ্যুৎশক্তি একে অপরের সমান হওয়ার ফলে সে বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ অবস্থায় বিরাজ করে।) সৌররশ্মিসংঘাতে একটি ইলেকট্রনকণা হারিয়ে সমস্ত পরমাণুটির ধনাত্মক বিদ্যুৎশক্তি গেল বেড়ে। এ নতুন নাম পেল, ধনাত্মক আয়ন। ছাড়া পাওয়া ইলেকট্রন চট্ করে ঢুকে পড়ল সবচেয়ে কাছের পরমাণুটার অন্দরমহলে। একটি বাড়তি না-ধর্মী ইলেকট্রন লাভ করে এই দ্বিতীয় পরমাণুটির বিদ্যুৎ-চেহারা হয়ে দাঁড়াল ঋণাত্মক। একে বলা হবে, ঋণাত্মক আয়ন।

দু জাতের প্রচুর আয়ন গড়ে উঠতে লাগল এভাবে। আয়নেরা হচ্ছে সুন্দর বিদ্যুৎ-পরিবাহী, গোছা গোছা বিদ্যুৎস্রোত ছোটাছুটি করে বেড়াতে লাগল এদের মধ্যে দিয়ে। এক আশ্চর্য ক্ষমতাকে এরা আবার লাভ করে বসে আছে। আয়না যেমন প্রতিফলিত করে আলোর কণাকে, এরা তেমনি প্রতিফলিত করবে বেতারতরঙ্গের ঝাঁককে। আয়নমণ্ডলের বাড়িটাকে বিজ্ঞানীরা আবার চারতলায় ভাগ করেছেন। শর্ট-ওয়েভের বেতার-ঢেউয়ের এক এক দল এক একটা আয়নস্তর থেকে ঠিকরে ফিরে আসে মাটিতে। মাটি থেকে আবার আকাশ, আকাশ থেকে মাটি—এমনি ধারায় ক্রমাগত প্রতিফলনের মধ্যে দিয়ে আকাশবাণী ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। খুব ছোট মাপের আকাশবাণী আছেএকদল যারা আয়নস্তর থেকে প্রতিফলিত হয় না, একেবারে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফুঁড়ে বেরিয়ে পালিয়ে যায় মহাকাশে। রাডার, টেলিভিশনের বেতার-ঢেউ এই দলে পড়ে।

আয়নমণ্ডলের সুন্দর সাজানো ব্যবস্থার মধ্যে হঠাৎ বিপর্যয় ঘটে। সৌরকলঙ্ক দেখা দিলেই সূর্যের রশ্মি আর কণিকার জোর যায় বেড়ে আর তারই ধাক্কায় আয়নমণ্ডলের ওপরকার তিনটে স্তর নেমে এসে জুড়ে যায় একেবারে তলাকার স্তরটার সঙ্গে। সেই পুরু স্তরটা তখন যাবতীয় বেতার-ঢেউকে বেমালুম হজম করে বসে ফিরিয়ে দেয় না কিছুই। বেতারবার্তার আদানপ্রদান মুহূর্তে অচল অবস্থায় পৌছয়। সৌরকলঙ্কের তীব্রতা কমলেই আয়নমণ্ডল আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, আকাশবাণীর চলাচলও শুরু হয়।

আয়নমণ্ডলের এই খামখেয়ালিপনার সঠিক কার্যকারণ পৃথিবীতে বসে বোঝা সম্ভব নয়। একদিক থেকে দেখার ফলে তার আংশিক রূপটাই চোখে পড়ার কথা। এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের দূত স্পুৎনিক বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করবে। তার যন্ত্রসজ্জার কলকাঠির নাড়াচাড়ায় লব্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্য আলট্রা-শর্ট-ওয়েভ বা খুব ছোট মাপের আকাশবাণীতে রূপ পালটে মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীতে পৌছচ্ছে। আসার পথ যেটুকু আঁকাবাঁকা হচ্ছে, তার হদিশ মিলিয়ে আয়নমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের বৈদ্যুতিক ঘনত্ব ও সমগ্র অঞ্চলটার একটা এক্স-রে ছবি বিজ্ঞানীরা লাভ করে বসবেন। এই জ্ঞানের আলোতে বেতারবার্তার ভবিষ্যৎ আদানপ্রদান ব্যবস্থার মধ্যে বিপুল উন্নতিসাধন সম্ভবপর হয়ে উঠবে।

মেরু অঞ্চলে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটতে দেখা যায়, অবিচ্ছিন্ন একটানা ছ' মাস রাত্রির পর্যায় যখন শুরু হয়। সূর্য না থাকায় আয়নমণ্ডল তৈরির উপকরণের সম্পূর্ণ অসদ্ভাব, অথচ শর্ট-ওয়েভ বেতারবার্তার আদান-প্রদান কিছুমাত্র ব্যাহত হয় না। উর্ধ্বাকাশ থেকে কিভাবে আকাশবাণীর প্রতিফলন ঘটছে, এ রহস্যের মর্ম উদ্ঘাটনের জন্যে বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে উদগ্রীব। হয়তো উল্কাকণাদের প্রতিনিয়ত সংঘাতের ফলে আয়নিতকরণের কাজ অব্যাহত থাকে—অবশ্য এটাও অনুমান মাত্র।

চুম্বকত্ব

পৃথিবী যে একটি চুম্বক—কম্পাসের কাঁটার চালচলনে অনেকদিন আগেই সে-কথা বোঝা গিয়েছিল। চুম্বকত্বের মূল কারণ নিয়ে তর্কের শেষ আজো হয় নি।

পৃথিবীর চৌম্বক-ক্ষেত্রটা স্থির নয়, সদাপরিবর্তনশীল। সে পরিবর্তনের মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখলেন—নেপথ্যে রয়েছেন স্বয়ং সূর্যদেব। দুয়ের যোগাযোগের সঠিক চেহারার বিশ্লেষণ চলেছে, স্পুৎনিকের ম্যাগনিটোমিটার যন্ত্রের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে। এ যন্ত্রটির কাজ যে কোনো বস্তুর চৌম্বকক্ষেত্রকে পরিমাপ করা। স্পুৎনিকের কাছ থেকে জানা গেছে, পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র মহাকাশে ২৫০০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত।

পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে যুগান্তকারী যে আবিষ্কারটি ঘটেছে, তা হল পৃথিবীকে বন্ধনীর মতো ঘিরে দুটি তেজস্ক্রিয় রশ্মির বলয়ের অবস্থিতি। একটি আমেরিকান স্পুৎনিকের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রব্যবস্থার দৌলতে এই খবরটি পাওয়া গেছে। কাছের বলয়টি পৃথিবীর দু' থেকে চার হাজার মাইল ও দূরের বলয়টি আট থেকে বারো হাজার মাইলের মধ্যে অবস্থিত। বলয়দুটির সবচেয়ে বেশি তীব্রতা অনুভূত হয় পৃথিবীর আড়াই ও দশ হাজার মাইল দূরে দূরে। কাছের বলয়টি গড়ে উঠেছে একশ কোটি ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন প্রোটন বস্তুকণাদের নিয়ে। খুব শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মির এরা একটি মূল উপাদান এবং এই রশ্মির কল্যাণেই প্রথম বলয়টির সৃষ্টি, বিজ্ঞানীরা এরূপ অনুমান করেন। পৃথিবীর দিকে নেমে আসার সময় এরা তার চৌম্বকরশ্মির বেড়াজালে বন্দী হয়ে পড়ে আর কর্কস্ক্রুর মত পাক খেতে থাকে পৃথিবীর উত্তরপ্রান্ত থেকে দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত। দূরের বলয়টির মূল উপাদান সৌরকণিকা এবং একইভাবে তারাও ঘুরপাক খেয়ে চলে। শক্তির মাপে এরা অবশ্য অনেক খাটো।

এই কাছের বলয়টি বিজ্ঞানীদের বিশেষভাবে চিন্তিত করে তুলেছে। এর লেজের দিকটা মাঝেমাঝে পৃথিবীর তিন চারশ' মাইলের মধ্যে এসে পৌছয়। তখন কোনো মহাকাশযান এর তেজস্ক্রিয় কণাদের সংঘাতে জড়িয়ে পড়লে তার অভ্যন্তরে জন্মাবে একজাতের শক্তিশালী রঞ্জন-রশ্মি—যার সংযোগ যে কোনো প্রাণীদেহের পক্ষেই হবে মারাত্মক। যে কারণে সমস্ত মহাকাশযাত্রীদের কক্ষপথের সর্বোচ্চ দূরত্ব পৃথিবীর দুশ মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল।

এই তেজস্ক্রিয় বলয়দুটির সৃষ্টির সমগ্র কার্যকারণ জানার জন্যে বিজ্ঞানীরা খুবই উদগ্রীব। মানুষের ভবিষ্যৎ দূর মহাকাশযাত্রার পথে এরা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে কিনা, সেটাই প্রশ্ন।

মাধ্যাকর্ষণ

মাধ্যাকর্ষণ বলের পরিমাণ পৃথিবীর সর্বত্র সমান নয়। যেখানে বস্তু ঘন ও পরিমাণে বেশি, সেখানে এর প্রভাব বেশি মাত্রায় অনুভূত হবে। পরীক্ষা-কাজের জন্যে পেণ্ডুলাম বা ঘড়ির দোলক হল বিজ্ঞানীদের এক ভারী সুন্দর যন্ত্র। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এই দোলকের আন্দোলনের হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষ্য করে তাঁরা বুঝতে পারেন, কোথায় মাধ্যাকর্ষণ কম, কোথায় বেশি। (একই কাজের জন্যে এখন গ্র্যাভিমিটার যন্ত্রকে ব্যবহার করা হচ্ছে—এ পেণ্ডুলামেরই উন্নত সংস্করণ।) এভাবে সমগ্র পৃথিবীর একটি নিখুঁত 'মহাকর্ষ মানচিত্র' তাঁরা তৈরি করে ফেলতে চান। পৃথিবী ও তার উপরিভাগের গঠনবৈচিত্র্য সম্বন্ধে পরিষ্কার একটি ধারণা গড়ে তুলতে যা তাদের বিশেষ সাহায্য করবে। তাঁরা বুঝতে চান, কোনো পর্বত মহাদেশের জমির ওপর শুধু ভেসে রয়েছে কিনা, আবার কারো শেকড় ভূগর্ভে দশ মাইল গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত কিনা। কুমেরু অঞ্চলে বরফের তলায় সত্যি কোনো মহাদেশ আছে কি নেই, তাও তাঁরা জানতে চান।

এ বিষয়ের গবেষণাকাজেও স্পুৎনিক একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করবে। স্পুৎনিকের পৃথিবী পরিক্রমার সময় তার বিভিন্ন কক্ষপথের নির্দিষ্ট চেহারায় যেটুকু বিচ্যুতি ঘটবে, তা বিভিন্ন স্থানে পৃথিবীর বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণে ও উপরিভাগের (crust) ঘনত্ব ও গঠন নির্ণয়ে বিশেষ সাহায্য করবে।

সূর্যের আকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ারের জল কোথাও কোথাও পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে উঠতে পারে। পৃথিবীর মহাদেশের জমির বুকেও সেই আকর্ষণে জোয়ার জাগে, তবে উচ্চতায় পাঁচ ইঞ্চির বেশি পৌঁছয় না। মাটির ওপর এই ছোট্ট জোয়ারের ঢেউয়ের ওঠানামা—এ যেন পৃথিবীর শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো। তার প্রকৃতি বিশ্লেষণে জমির শক্তি ও কাঠিন্য জানা যাবে। এই ঘটনায়, পৃথিবীর কেন্দ্রটা যে তরল, তার সমর্থনে একটি বড়ো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। অনুমান করা হয় সেই কেন্দ্রটাও এই জোয়ারের তালে ওঠানামা করে।

ভূকম্পনতত্ত্ব

মাতা ধরিত্রীর গর্ভে আলোড়নের শেষ আজো হয় নি। ভূকম্প হচ্ছে তারই বহিঃপ্রকাশ। প্রায় প্রতি বছরই ছ'টি বড় ও ৬০০টি ছোট ভূকম্প পৃথিবীর

বিভিন্ন স্থানে ঘটে চলেছে। ছোটরা অবশ্য এতই স্বল্পশক্তির যে অতিসূক্ষ্ম সিসমোগ্রাফের (ভূকম্পনির্ণয়যন্ত্র) কাঁটার আন্দোলন ছাড়া তাদের বোঝার উপায় নেই। কোথাও ভূকম্প ঘটলেই মাটির ভেতর দিয়ে তা ঢেউয়ের আকারে ছড়িয়ে চলে চতুর্দিকে, যাদের বিশ্লেষণে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন স্তরের গঠনবিন্যাস সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ছবি লাভ করে চলেছেন।

পৃথিবীর একেবারে কেন্দ্রে রয়েছে ২২০০ মাইল পুরু একটি তরল গোলক, নিকেল আর লোহা যার উপাদান। তার ওপরে হল ১৭০০ মাইল পুরু ম্যান্টল—শক্ত ব্যাসল্ট পাথরে তৈরি। সকলের ওপরের অংশটা ২০ মাইলের মত পুরু—হালকা গ্র্যানিট আর ব্যাসল্ট পাথরে যারা গড়ে উঠেছে। সমুদ্র-গর্ভে পৃথিবীর এই পৃষ্ঠদেশ মাত্র পাঁচ মাইল পুরু।

বেশির ভাগ ভূকম্পের উৎস হল সমুদ্রগর্ভে। অনুসন্ধানের ফলে এক আশ্চর্য খবর পাওয়া গেছে। সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে এক বিরাট ফাটল—উত্তর মহাসাগর থেকে যার শুরু, আটলান্টিক মহাসাগর বরাবর দক্ষিণে পৌঁছে কুমেরুকে বৃত্তাকারে ঘুরে, প্রশান্ত মহাসাগরের দুপাশ জুড়ে যার বিস্তৃতি। গভীরতায় এ প্রায় দু থেকে পাঁচ মাইল, প্রস্থে কুড়ি থেকে পঁচিশ মাইল। ফাটলের দুপাশ বরাবর পাহাড়ের দেয়াল উঠে গেছে—উচ্চতায় যা এক থেকে দু মাইল। পৃথিবীর বেশির ভাগ ভূকম্পের আস্তানা হল এর সমগ্র অঞ্চল জুড়ে। ভূগর্ভস্থ আন্দোলন এখানে বেশ জোরালো এবং একই সঙ্গে পর্বতগড়ার কাজও চলেছে। ফাটলের ধারে ধারে রয়েছে বহু আগ্নেয়পর্বত—যারা মাঝে মাঝে সমুদ্রের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সৃষ্টি করেছে শ্রেণীবদ্ধ দ্বীপমালা, যেমন প্রশান্ত মহাসাগরে এ্যালিউশিন, জাপান, কুরিল, ইন্দোনেশিয়া ; আটলান্টিক মহাসাগরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও দক্ষিণ মেরু সাগরে সাউথ সেটল্যাণ্ড দ্বীপ। সমুদ্রগর্ভের একটি পরিষ্কার ছবি ও তার গঠনসংক্রান্ত সমগ্র তথ্য পাওয়া গেলে বহু পূর্বাহ্নেই সম্ভাব্য ভূকম্পের সঙ্কেত সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য হবে না।

তেজস্ক্রিয়তার গবেষণা

পৃথিবীর অভ্যন্তরে নানাবিধ তেজস্ক্রিয় পদার্থ রয়েছে—যেমন রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম ইত্যাদি, যাদের ক্রমাগত বিকীরণজনিত প্রক্রিয়ায়

পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপের সৃষ্টি। এই স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তার সঙ্গে যুক্ত হয় একটি কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা। ঊর্ধ্বাকাশে বায়ুর নাইট্রোজেন কণিকা ও মহাজাগতিক রশ্মির সংঘাতে তেজস্ক্রিয় কার্বন ১৪ ও ট্রাইটিয়াস কণিকা সৃষ্ট হয়ে চলেছে। তারা প্রথমে প্রবেশ করে মেঘরাজ্যে তারপর নেমে আসে বৃষ্টিধারার সঙ্গে মাটিতে, নদীর জলে, সাগরে। মাটি থেকে গুল্ম ও বৃক্ষের শেকড়ের মাধ্যমে তার শাখাপ্রশাখা, সেখান থেকে পত্র ও তৃণভোজী প্রাণী-দেহে—এভাবে ছড়িয়ে চলে চক্রাকারে। ফলে পৃথিবীর প্রতিটি জায়গায় কি পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বস্তুর সমাবেশ ঘটছে, তার গবেষণার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই অনুসন্ধানের সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের তেজস্ক্রিয়তা নির্ধারণ ছিল আ-ভূ-বর্ষের অন্যতম কার্য্যক্রম।

১৯৪৫ সালের আগে পর্যন্ত কি পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা পৃথিবীতে জমা হয়েছে, তা জানার জন্যে হিমবাহবিজ্ঞানীরা বরফের স্তর নিয়ে গবেষণা করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন যুগে জল জমে বরফ হওয়ার সময় কিছু ট্রাইটিয়ামও তার মধ্যে বাঁধা পড়েছে। আনুপাতিক হিসেবে পৃথিবীর জলে কতটা ট্রাইটিয়াম ছিল, জানা যাবে। আ-ভূ-বর্ষের পুরো দেড় বছর জুড়ে বিজ্ঞানীরা আমেরিকা, কানাডা, রাশিয়া, ইংলণ্ড, ভারত—বিভিন্ন দেশে জল ও বাতাসের নমুনা সংগ্রহ করে এক লাইব্রেরি গড়ে চলেছিলেন। উদ্দেশ্যটা ছিল এই, আগের হিসেবের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করে দেখা—পৃথিবীর তেজস্ক্রিয়তা বাড়ছে কিনা। আরো কয়েকটি আইসোটোপ বা তেজস্ক্রিয় জুড়িদারের সন্ধান বিজ্ঞানীরা এই সঙ্গে করেছেন, যেমন ষ্ট্রনটিয়াম ৯০, সিজিয়াম ১৩৭ ইত্যাদি, যারা অনুপাতে বেড়ে চলতে থাকলে প্রাণীদেহের পক্ষে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

পৃথিবীর পরিমাপ

পৃথিবীর স্থলভাগ ও জলভাগ জরীপের কাজ খুব সম্পূর্ণ নয় বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন। সমুদ্রের মধ্যে কোন plumb line বা খুঁটিপোতা জাতীয় ব্যাপার সম্ভব নয় বলে, গোলমালটা সেখানে আরো বেশি। তাই মানচিত্রে সীমানানির্ধারণে কয়েক শ ফুট থেকে শুরু করে কয়েক মাইল পর্যন্ত ভুল থেকে যাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। পৃথিবীর বিস্তৃত ভূখণ্ড ও জলভাগের ওপর

উড্ডয়নকালীন অবস্থায় স্পুৎনিক বিজ্ঞানীদের কাছে জরীপ কাজের একটি আদর্শ খুঁটির ভূমিকা গ্রহণ করবে।

পৃথিবীর আকৃতি সম্বন্ধে নতুন একটি খবর পাওয়া গেছে। একটি আমেরিকান স্পুৎনিকের কক্ষপথের চেহারা বিশ্লেষণে ধরা পড়ল, উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে তার চলবার ধারাটা একটু অস্বাভাবিক। তা থেকে সিদ্ধান্ত হলো এই, পৃথিবীর আকার একটি পিয়ার ফলের মতো। উত্তরমেরু অঞ্চলে পঞ্চাশ ফুটের মতো একটা জায়গা উঁচু হয়ে ঠেলে বেরিয়ে আছে ও দক্ষিণমেরু অঞ্চলে সমপরিমাণ একটা জায়গা ভেতরে বসানো। অঙ্কের হিসেবে ব্যাপারটা খুবই ছোট কিন্তু এরই ফলে ভূবিজ্ঞানশাস্ত্রের একটা মস্ত তত্ত্ব "পৃথিবীর স্থিতিস্থাপকধর্মীতা" (Plasticity of the Earth) নাকি টলতে বসেছে। এই তত্ত্বের মূল কথাটা হলো—পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ কোনো আলোড়ন বা আবর্তনে যদি উপরিভাগে কোনো বিকৃতি দেখা দেয়, সেটা সাময়িক মাত্র। আভ্যন্তরীণ চাপ সমতায় পৌছলেই স্বাভাবিক চেহারা ফিরে পেতে দেরি হয় না। যাই হোক, এই তথ্য পুরোপুরি গ্রহণের আগে এ বিষয়ে গবেষণার এখনো যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

ঊর্ধ্বাকাশ গবেষণা ও স্পুৎনিক

স্পুৎনিক ছিল মহাকাশে পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের দূত। ডিম্বাকৃতি (elliptical) কক্ষপথের Perigee বা অপভূতে (পৃথিবীর নিকটতম বিন্দু) কিছু কিছু স্পুৎনিক বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বতম স্তরগুলোয় প্রবেশ করে। তখন তাদের আভ্যন্তরীণ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ঊর্ধ্বাকাশে বায়ুর ঘনত্ব, চাপ, গঠন, মহাকাশ-রশ্মিদের প্রাথমিক চরিত্র, উল্কাদের সংখ্যা ও তাদের সংঘাতের তীব্রতা ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু তথ্য পাঠিয়েছে। এ প্রসঙ্গে গবেষণার কথা অন্যান্য বিভাগের আলোচনায় কিছু কিছু বলা হয়েছে।

মানুষের হাতেগড়া স্পুৎনিকের সংখ্যা এ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে ছিয়ানব্বুইটি। জ্ঞানবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ এক নতুন জগতের দিগন্ত এরা খুলে দিয়েছে মানুষের সামনে। অনেক দিনের চেনা পৃথিবী, সূর্য ও অজানা মহাকাশের বহু রহস্য আজ বিজ্ঞানীদের আয়ত্তাধীন। আ-ভূ-বর্ষের প্রতিটি কার্যক্রম সার্থক করে তোলার পেছনে স্পুৎনিকের অবদান ছিল অপরিসীম। বিভিন্ন বিভাগে অজস্র তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। কিছু বিশ্লেষিত হয়েছে, কিছু হতে চলেছে।

সমগ্র তথ্যের সুষ্ঠু রূপায়ণে বেশ কয়েকবছর সময় প্রয়োজন হয়ে পড়বে। তখন বিজ্ঞানের এতদিনকার স্বীকৃত অনেক তত্ত্ব ও ধারণা যদি বাতিল হয়ে বসে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আ-ভূ-বর্ষের সাফল্য সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। যার ফলে কার্যকাল শেষ হবার পরেও কয়েকটি বিভাগে তাঁরা সম্মিলিতভাবে কাজ করে চলেছেন। আন্তর্জাতিকভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যে নতুন সহযোগিতার ক্ষেত্র তাঁরা রচনা করলেন ও করে চলেছেন, কালক্রমে তার জোরালো হাওয়া এসে লাগবে স্নায়ুযুদ্ধের একেবারে ভিতটার ওপর। তখন সেটা টিকে থাকতে পারলে হয়!

একটি রাজনৈতিক কবিতা

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

অগ্নিময় চতুর্দিক। দীপ্ত শিখা লাওসে, সুয়েজে
সাহারার মরুবালু কেঁপে ওঠে দুরন্ত ঝঞ্ঝায়
শয়তান চক্রান্ত করে তিনমাথা এক হলে; হায়
ছত্রহীন ঈশ্বরের পুত্রকন্যা বৃষ্টিপাতে ভেজে!

আরব দুহিতা কিংবা কঙ্গোপুত্র জিঘাংসার বলি
শৃঙ্খলিত নতশির সারি বাঁধে বধ্যভূমিপাশে
নির্বাক মায়ের অশ্রু; কাপুরুষ পিতার অঞ্জলি
নেপথ্যে যীশুর আত্মা তৃপ্ত হয়ে হা হা করে হাসে।

ধর্ষিতা ভগ্নীর ভ্রাতা জেগে ওঠে এশিয়ার প্রতি ঘরে ঘরে
মালয় কোরিয়া চীন জাপানে ও কলম্বোপ্রান্তরে
মুক্তির প্রত্যাশা করে আলজিয়র্স, গুণে চলে অগ্নিগর্ভ দিন
লক্ষ বুকে জেগে ওঠে লক্ষ কাস্ত্রো, সহস্র লেনিন।

দিনান্তের ছায়া নামে, দুশ্চরিত্র সূর্য দেয় উঁকি
সলজ্জ কৈশোর ঢাকে যৌবনের দুটি সূর্যমুখী।

আলোকস্তম্ভ ঃ ১

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

অসংখ্য আলোকস্তম্ভ কে আবার দেখাবে আমাকে ?
হিংস্রজলকরতলে কতকাল প্রবাসী জাহাজ।
দেখেনি নীলিম-তট নারিকেলকুঞ্জঘন। যাকে
দেখেছে, সে নহে প্রিয়, আত্মীয় নহে তো কেহ আজ।
যারা ওঠে-নামে নানা বন্দরের মুখরিত ঘাটে
তারাও অপরিচিত, একবার ফিরেও চাহে না
যার বক্ষে এতকাল কাটিয়াছে। নিরুদ্বেগ হাঁটে
সঙ্কীর্ণ সরণি বাহি। কোনো মুখ নাহি যায় চেনা।
অজস্র আলোকস্তম্ভ কে দেখায় আমাকে আবার ?
তোমরা নতুন যাত্রী—তোমাদের দীপ্ত করতলে
প্রদীপ্ত লণ্ঠন। মুখ আশায় জ্বলিয়া ওঠে কার ?
যেন দেবদূত—যার মুখদ্যুতি কাঁপে কৃষ্ণজলে।
ওই মুখগুলি যদি আলোকের স্তম্ভ, আমি আজ
সামগ্রিক সর্বনাশ হতে রক্ষা করেছি জাহাজ।

ক্রান্তিকালের কোনো এক শিশুকে

কমলেশ সেন

হে ক্রান্তিকালের মানুষ
দেখো দেখো
সমুদ্রের সিংহাসনে
স্বর্ণ সিংহের পাদুকা, আলোকবর্ষী প্রাচীপট
দেখো দেখো
সমুদ্রের সিংহাসনে, সিংহাসনের সমুদ্রে
বাতাসের রক্তাভ কেশর
অভ্রময় ব্যাঘ্র কেতন
নরসিংহের আগ্নেয় বিভূতি।

আর
আর আমি
আমি এই ক্রান্তিকালের দুর্ধর্ষ শিশু
দুর্ধর্ষ শিশুদের এই ক্রান্তিকালে
হে পিতা, হে প্র-পিতামহ
তোমাদের মৃতনগরীর
তোমাদের আলোকবর্ষী মৃতনগরীর
প্রাচীপটে
রেখে গেলাম আমার
রক্তাক্ত বিবেক, বিবেকের রক্তাক্ত সংগ্রাম
সমুদ্রের গর্জন আর গর্জনের সমুদ্রে
হিরণ্যকশিপু।

পিতা, হে অগ্নিময় নরসিংহ
হে নরসিংহের অগ্নিময়তা
তোমার স্বর্ণগর্ভ কমণ্ডলুর, তোমার
রুদ্রাক্ষের কণ্ঠহারে
তোমার নখাভাসের বিক্রমস্বর্গে
জলভুক সমুদ্র সারথী, আমি
আমি এই বর্ণাভ দুর্ধর্ষ শিশু, আর
সুরঙ্গমা উদ্ভিদের পৃথিবী, পৃথিবীর
সুরঙ্গমা উদ্ভিদ।

আমাকে তুমি দাও
দাও তোমার হাতের মণিপদ্মে
মহাজাগতিক শক্তির বিদ্যুৎ
দাও তোমার মেধা আর প্রজ্ঞা ;
আমার পিঠে
আমার পিঠের প্রবাল ছায়ায় কাঁপে
কালপুরুষের দ্যুতি
বাতাসের রক্তবলয়
আর প্রজাপতির নগর তোরণ।

তোমার মৃত্যু হলো
আমি দেখলাম
তোমার জন্ম হলো
আমি দেখলাম
তোমার জলগম্ভীর, তোমার অগ্নিগর্ভ
মৃতনগরীর
তোমার লবণাক্ত, তোমার
লবণাক্ত স্বর্ণ নিনাদে
নেপচুন, প্লুটো আর সূর্যগ্রহণ
শ্বেতকেতু আর আমি

আমি তোমার আগ্নেয় প্রতিভা।

দেখো দেখো
হে ক্রান্তিকালের মানুষ
দেখো
সূর্যের পোতাগ্রে
জলস্তম্ভে
সর্প-সিংহের পাদুকায়, পাদুকার সর্প-সিংহে
তোমাদের ক্রান্তিকালের
মহাদ্যুতিমান পুরন্দর।

পিতা, হে অগ্নিময় নরসিংহ
হে নরসিংহের অগ্নিময়তা
আর এক দুর্ধর্ষ সৌরমণ্ডল।

চায়ের আসরে

তরুণ সেন

আমরা গৃহকর্ত্রীর সুখ্যাতি করলাম। বন্ধুর কিছু ঈর্ষা
এবং লজ্জা। আমরা উপভোগ করলাম এবং বললাম—
"আহা এমন আসর। কেবল আসরের মৌতাতে
বেঁচে থাকা।" "কিন্তু কদিন?"

ভাবটা দার্শনিক। ভঙ্গি ততোধিক। এবং সংক্রামক।
লুনিক, উরি ও টিটভ্, কেনেডি ও পরমাণু
সব চায়ের চামচে মাপলাম। ভাবনাগুলো
তর্কের হাওয়ায় ঘোলাটে হলো। অস্তিত্ব হারাল।
সঙ্গের তলানি থিতিয়ে এলো। দৃশ্যটা গম্ভীর।

তারপর পরম ঔদাস্যে আমরা নির্লিপ্ত চিন্তায়
ভাবনার তলানি রেখে উঠে পড়লাম। রক্তে আমেজ এলো
বিষটুকু রেখে আমরা সবাই হলাম নির্বিকার নীলকণ্ঠ।

জতুগৃহ

বিজন ভট্টাচার্য

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

হাল ফ্যাশনের অ সবাবে সাজানো প্রশস্ত একখানি ড্রইংরুম। রঞ্জন রায় একা বসে সিগারেটের পর সিগারেট টেনে সময় ক্ষেপন করছে। অস্বস্তি আর ক্লান্তি, দুটোই তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর। হঠাৎ উঠে পড়ে রঞ্জন রায়। বারকয়েক অস্থির পদচারণা করে। এগিয়ে যায় দরজার দিকে।

রঞ্জন : This waiting and waiting.—লতা! লতা আছো!…

[নেপথ্যে নারী কণ্ঠ : আছি!]

…ছ্যাৎ কচুপোড়া, থাকো, আমি যাচ্ছি।

[ত্রস্তে লতার প্রবেশ]

লতা : কি হলো? কোথায় যাচ্ছ?

রঞ্জন : কেন, আমার কোনো যাবার জায়গা থাকতে পারে না?

লতা : বাব্বাঃ, রঞ্জন রায়ের যাবার জায়গার অভাব, এ কথা শত্তুরেও বলতে পারবে না। কিন্তু এই ভরসন্ধেবেলা ছোট্ট বৌদিটিকে একা ফেলে যাচ্ছ, কাজটা কি ভাই খুব ভালো হচ্ছে?

রঞ্জন : একাটা আবার কোথায়। আমি তো দেখছি তুমি সারাক্ষণই ভেতরে ব্যস্ত হয়ে আছো। তোমার শ্বশুর বাড়ির সিলিং-টা পর্যন্ত ঢালাই কংক্রিট-এর, কড়িকাঠ অবধি নেই যে গুণে দেখব।

লতা : এক বিহনে দেখছি গোটা বৃন্দাবনই অন্ধকার, বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু কি করব ভাই বলো? আমার তো আর কোনো হাত নেই!

রঞ্জন : না না, তোমার হাতে থাকতে যাবে কেন। ব্যাপারটা যদি সত্যি

সত্যিই আমার হাতে না থাকে তো তুমিই বা করবে কি? (নিজের হাত দেখে) রাশি চক্র না কি যেন সব বলে তোমাদের!

লতা : ঠাট্টা করছ তো?

রঞ্জন : না।

লতা : আচ্ছা, তোমায় আমি একদিন নিয়ে যাব'খন হারান ভট্টচাজ্জের কাছে। এমনিতে হাতটাত বড় একটা দেখেন না। তবে গণনা যা করেন ভাই, একেবারে অভ্রান্ত। তিনিই তো অমলের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা বলেছিলেন, অথচ ছ্যাখ কোনো জানাশোনা ছিল না।

[রঞ্জন রায় সিগারেট-প্যাকেটের ভেতরকার সাদা flap-এ কোষ্ঠীর ছক আঁকে অন্য মনে গল্প শুনতে শুনতে]

রঞ্জন : য়্যাসা!

লতা : তোমাকে ছুঁয়ে বলছি ভাই, এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না। অমুখ মাস অমুখ দিন অমুখ-এর সঙ্গে অমুখ নক্ষত্রে তোমার বিয়ে, আর কি না ঠিক তাই হলো, কি বলছ কি?...তুমি বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।

রঞ্জন : হুঁ, তা হলে অবিশ্যি বলতেই হবে মগজমে কুছ্ শাস্ত্রজ্ঞান হ্যায়।

লতা : না না, তোমার গিয়ে সেই হস্তরেখা বিচার করে তিনি কথা বলেন না; no astrology business. His is the stars and Moon. রীতিমতো Calculation করে কথা বলেন।

রঞ্জন : আচ্ছা!

লতা : You will see.

রঞ্জন : বুঝলাম, কিন্তু এ বিষয়ে আমি তো তাঁকে entrust করতে পারব না লতা।

লতা : কেন?

রঞ্জন : পারব না এই কারণে যে সত্যিই যদি ব্যাপারটা ভাগ্যে ফসকে গিয়ে থাকে! বলো, অতবড় একখানা Blow বুক পেতে নিতে পারব?

লতা : সেটা অবিশ্যি একটা কথা। কিন্তু রঞ্জন আমি অবাক হয়ে ভাবি

যে তোমার মতো ছেলে, আমি ভাবতে পারি না। বালিগঞ্জের সনকা সেন, এলাহাবাদের এষা পালিত থাকতে...

রঞ্জন : ঐ তোমার যত আজেবাজে ভাবনা। অথচ যেটা ভাবলে কাজ হয়, যেটা তোমার হাতের মুঠোয় রয়েছে...

লতা : ব্যাপার এতটাই গড়িয়েছে নাকি?

রঞ্জন : ব্যাপার তো গড়াচ্ছে না ভাই, নিজেই গড়িয়ে যাচ্ছি। বুঝতেই পাচ্ছি না...

লতা : না সত্যিই এবার কল্যাণীকে আমি মারব। সে কি ভেবেছে কি?

রঞ্জন : না বাপু মারধর করো না, ও জবরদস্তি প্রেম...

লতা : জবরদস্তি আবার কি? রাগ হয়ে যায় কথা শুনলে আমার।... কিন্তু এ-ও তো আমি বুঝতে পারি না রঞ্জন, তোমার কথা বল্লেই সে যে রকম প্রাণোচ্ছ্বাস দেখায়, যতটা interest নিয়ে কথা বলে...

রঞ্জন : হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো তার কিছুটা শুনব, কিছুটা বুঝব!

লতা : আশ্চর্য! আচ্ছা দাঁড়াও, কল্যাণীর সঙ্গে খোলাখুলি আমি একবার কথা বলে দেখি। আমার তো মনে হয়...

রঞ্জন : ছ্যাখ।

লতা : কি হয় জানো ভাই, সকাল থেকে রাত অবধি কারো সঙ্গে দু-দণ্ড বসে যে কথা বলব। আর কল্যাণীর সঙ্গে আমার তো দেখাই হয় না। সংসারের এত তাল আর ঝামেলা...আর সবাই তো মক্ষীরানী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! আরও হয়েছেন তোমার প্রাণের বন্ধু অমলবাবু, অমলের জন্যে আমি এক দণ্ড শান্তিতে তিষ্ঠুতে পারি না এ বাড়িতে। তার এত বখেড়া...

রঞ্জন : কেন, অমল আবার তোমায় কি করল?

লতা : কি করল না বলতে পারো? যাগ গে, থাক সে সব কথা।

রঞ্জন : কি ব্যাপার!

লতা : ব্যাপার আর কি বলব ভাই। সংক্ষেপে শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, সারা শরীর তন্নতন্ন করে খুঁজেও এক বিন্দু রক্ত কি কোনো ক্ষতচিহ্ন পাওয়া গেল না, অথচ পরীক্ষা করে ডাক্তার

বল্লেন, দেহে প্রাণস্পন্দন অনেকক্ষণ আগেই বন্ধ হয়ে গেছে—কতকটা এইরকম আর কি। At times, I feel so miserable Ranjan.

রঞ্জন : কিন্তু অমল তো শুনি…

লতা : নিজেই কি শান্তিতে আছে ?…to fire from the frying pan and again to the frying pan from fire.

রঞ্জন : কেন, Jolly good Guy, দিব্যি আছে, ব্যবসা করছে, টাকা পিটছে…

লতা : পিটছেন না, পিট্টি খাচ্ছেন।

রঞ্জন : কি রকম।

লতা : থাক রঞ্জন, সে সব কথা বলে তোমাকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া হবে।

রঞ্জন : তা আর একটু না হয় দিলেই বা। আর দিলে তো সে তুমিই দেবে। আপত্তি না থাকে তো বলতে পারো কথাটা লতা।

লতা : অমলকে তুমি কিন্তু এর একটা কথাও বলতে পারবে না।

রঞ্জন : বেশ, বলব না।

লতা : …সেই business-এ টাকা লাগবে টাকা লাগবে বলে মায়ের কাছ থেকে তো তুতিয়ে পাতিয়ে দলিল পত্তর সব বার করে নিয়েছিল, সাত বছর আগেকার কথা, আর তুমিও জানো সে কথা…।

অমল : যাগ গে, হবে।

লতা : তোমার টাকা পাবারও আগে।

অমল : একটু একটু মনে পড়ছে।

লতা : …কত্তা আবার ঘটনাটা জানতে না পারেন তাই নিয়ে সে কত রাত অবধি আমাদের সলা পরামর্শ, ছিলে তুমি সেদিন সে রাত্রে।

অমল : yes, right. মনে পড়েছে।

লতা : তখন তো দারুণ একটা Boom period, পুরোদস্তুর inflation—ধুলো মুঠো করে ধরলে সোনা হয়ে যাচ্ছে অমলের হাতে, সময়টা তো তখন অসম্ভব ভালো গেছে—তখন আমি পই পই করে বলেছিলাম—অমল! তুমি আর যাই করো বাড়ির মর্টগেজটা অন্তত ছাড়িয়ে ফেলো, যাঁর বাড়ি হস্তান্তর করে দাও তাঁকে এই সময়। তা সে তখন মেজাজ গরম বাবুর, কাঁচা টাকা আসছে হাতে, আমার কথা তো শুনল না, বল্লে, ও যেমনি আছে তেমনিই থাক, business expansion-এর সময় এখন, mortgage-এর সময় expire করতে করতে এই দেড়লাখ. টাকা পাঁচ লাখ টাকা উশুল করে আনবে। যা হোক সে বাড়ি তো যেমন তেমনই পড়ে রইল মাড়োয়ারীর খপ্পরে, কুঞ্জলালও মুখফুটে কোনোদিন কিচ্ছু বল্লো না—weather cock হয়ে বসে আছে সে share market-এর, সে কেন উবজে বলতে যাবে তোমার বাড়ি নাও টাকা দাও, সে জানে দিন একদিন ঘুরবেই, ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে ওদিকে পৈতৃক বাড়িও mortgage হয়ে পড়ে রইল আর এদিকে চলল senseless investment—যে যা বলছে তাই কিনছে, ভাবলে বুঝি বা ব্রহ্মাণ্ডটাই হয়ে যাবে তার একদিন,—ভীষণ alluring তো, জিনিসটাও alluring আর মানুষটাও জানো তুমি ambitious…

রঞ্জন : At times, I should say inordinately ambitious.

লতা : Right, right. আমি তো আপত্তি করছি না।

রঞ্জন : যা হোক।

লতা : তা এই সেদিন, মাসখানেকও হয় নি, একদিন রাত করে বাড়ি ফিরে বলছেন, লতা, বাড়িটা তুমি তখন ছাড়িয়ে নিতে বলেছিলে, কথাটা শুনলে ভালোই করতাম। কেন না এখন আমার হাতে দেড়লাখ টাকাও নেই যে মাড়োয়ারীর টাকা শোধ করে দেই। অথচ হাতে আছে মাত্র দিন সাতেকের সময়। সে খাওয়া নেই, ঘুম নেই…একটি সময়ের জন্যে বাড়িতে থাকছে না, চোরের মতো গুটি গুটি রাত্রে বাড়ি ফিরছে—এমন একটা অবস্থার মধ্যে দিন যাচ্ছে তাই যে তোমায় আর সে কথা বেশি কি বলব!

রঞ্জন : Disturbing no doubt—ভাবনাচিন্তা হবারই কথা, কিন্তু আহার নিদ্রা ত্যাগ করে…

লতা : কি করবে! কি করতে বলো! বলে তোমার বাবার

কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসো, তোমার বাবার অনেক টাকা।

রঞ্জন : Just like him. তারপর ?

লতা : আচ্ছা বলো রঞ্জন, আমি মেয়ে হয়ে···, আজ কত বছর বিয়ে হয়েছে বলো ? আর তা ছাড়া বাবার আর্থিক অবস্থা আগেকার মতো এখন আর flourishing নয় ; বুড়ো হয়েছেন, আর তারপর তাঁরও liabilities আছে প্রচুর সংসারে···

রঞ্জন : না না সে হয় না। হয় না, আর তা ছাড়া ঠিকও নয়। তুমি কেন হাত পাততে যাবে তোমার বাবার কাছে ?

লতা : কখনও হয় ?

রঞ্জন : Silly. তা সে যা হোক, এত মুষড়ে পড়বার কি আছে ? বিপদ ঠিকই, কিন্তু ভেঙে পড়লে কুঞ্জলাল কি ছেড়ে কথা কইবে ?

লতা : ভেঙে পড়াটা ঠিক না মানি, কিন্তু একটা বিপদ যখন আসে রঞ্জন—তখন it is really very difficult to keep one's nose up.

রঞ্জন : Any way, আপাতত নাকটা একটু সরিয়ে নেবে ? খোঁচা লেগে যেতে পারে আমার চোখে।

লতা : সত্যিই এতদিনে বুঝি থ্যাদাই হলো নাকটা।

রঞ্জন : যাগ গে, হিল্লে একটা হয়েই যাবে।

লতা : কি করে রঞ্জন !

রঞ্জন : ভগবান আছেন।

লতা : আছেন কি ?

রঞ্জন : উঃ, সাংঘাতিক সব সাংসারিক বিষয়কর্মের কথা তুলে মাথাটাই তুমি আমার ধরিয়ে দিলে লতা, একটু কফি খাওয়াতে পারো ?

লতা : ওমা, এক্ষুনি আনছি। কি কাণ্ড !

রঞ্জন : আরে না ঠিক আছে। মাথাটা আমার ইদানিং ধরেই থাকে, ছাড়ে না।

লতা : তাই বুঝি ! মুশকিলেরই কথা হলো।

রঞ্জন : খুব মুস্কিল।

লতা : দেখি ঠিক দাওয়াইটা বাৎলাতে পারি কি না।

রঞ্জন : ছাখো।··

লতা : বেয়ারা ! গোবর্ধন ! মতি !

রঞ্জন : ···তবে তুমি চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পারবে।

লতা : বলছো !···

···গোবর্ধন ; কফি নিয়ে এসো। [চাকর গোবর্ধন-এর প্রবেশ]

রঞ্জন : [ঘড়ি দেখে] উঃ, সাড়ে আট। [পায়চারি করে] অমল কি আজকাল রোজই রাত করে বাড়ি ফিরছে নাকি ?

লতা : প্রত্যেকটি দিন। দশটার এদিকে তো একদিনও নয়।

রঞ্জন : দশটা ?

লতা : কোনো কোনোদিন এগারোটাও বেজে যায়।

রঞ্জন : করে কি এত রাত অবধি !

লতা : ভগবান জানেন।

রঞ্জন : ক্লাবে ট্লাবেও বড়ো একটা দেখতে পাই না।

লতা : বল্লুম না ? কোনো কিছুরই ঠিক নেই তার।

···এসো, কফি খাবে এসো। [গোবর্ধন কফি দিয়ে যায়]

রঞ্জন : আচ্ছা লতা, কুঞ্জলালকে অমল কি ইতিমধ্যে বাড়ির ব্যাপারটা নিয়ে approach করেছিল ?—বলতে পারো ?

লতা : বহুবার।

রঞ্জন : কি বলে সে।

লতা : কি আবার বলবে। পুরো টাকা ছাড়া সে কিছুতেই হাতছাড়া করবে না বাড়ি।

রঞ্জন : পুরো টাকা ?

লতা : পুরো টাকা।···আর কেনই বা সে করবে বলো ? ব্যবসায়ী মানুষ। কেউ ছাড়ে ?

রঞ্জন : আমি ঠিক ছেড়ে দিতাম।

লতা : তা তুমি বলতে পারো।

রঞ্জন : ব্যবসায়ীরা সত্যিই ছাড়ে না। তুমি আমি তো আর জাত-ব্যবসায়ী নই।···তোমার চেহারা লতা কিন্তু ভীষণ খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

লতা : আজ ছ মাস ঘুমোই নি রঞ্জন, কি বলবে?

রঞ্জন : তাই মনে হচ্ছে যেন মোটা করে কাজল পরেছো। চোখটা তো ছিল!

লতা : তুমিই যা বল্লে রঞ্জন। রঞ্জন! রঞ্জন তুমি আমাকে…

রঞ্জন : টাকাটা যে আমি তোমায় কাল কি পরশু পৌঁছে দেবো, অমল যেন তার বিন্দুবিসর্গ না জানতে পারে লতা, কেমন!…টাকার কথা বলছিলে না?

লতা : কিন্তু রঞ্জন তুমি টাকা দেবে…

রঞ্জন : আমি ছাড়া দেড়লাখ টাকা তোমায় চট করে কে দেবে শুনি?

লতা : সত্যি রঞ্জন তুমি…Really I have no words to express my feeling Ranjan…

[হাত জড়িয়ে ধরে। হাতে হাত নিয়ে বসে]

…টাকা তো নিলাম, তারপর ফেরৎ দেবার ব্যাপারটা…

রঞ্জন : Payable when able. আর এর ভেতরে ধর যদি কুটুম্বিতেটা হয়েই যায়, তা হলে টাকাটা আমি তোমায় ঘটকালীর বারবরদারি হিসেবেও 'রাইট অফ' করে দিতে পারি। খুব একটা 'মিন সাম' হবে না আশা করি।

লতা : সত্যিই রঞ্জন, কথাটা তোমার মুখেই শোভা পায়।

[অমল গুপ্তর প্রবেশ]

অমল : হ্যালো হ্যালো হ্যালো হ্যালো! তারপর রঞ্জন রায়, কতক্ষণ?

রঞ্জন : অনেকক্ষণ। আজ যে এত তাড়াতাড়ি।

অমল : খবর পেয়ে ছুটে এলাম ঘর সামলাতে।

রঞ্জন : শেয়ার-মার্কেটে শুনতে পেলি বুঝি!

অমল : কোন জিনিসটার speculation হয় না ওখানে বলতে পারিস। খবর রাখিস না কিছুই!

রঞ্জন : রাসকেল।—রঞ্জন রায়ের সঙ্গে speculation-এ পেরে উঠবি?

অমল : পারি আর নাই পারি, লড়তে দোষ কি? অবিশ্যি সময়টা এখন একটু খারাপ যাচ্ছে।

রঞ্জন : কি রকম, দিনকাল ভালো যাচ্ছে না?

অমল : খুব খারাপ, অত্যন্ত খারাপ।…তোর কি! তোফা আছিস,

unearned increment-এর টাকা খাচ্ছিস, আর এর বউ তার বউ…

রঞ্জন : এই মুখ সামলে কথা বলবি অমল। লতা, ask your husband to behave.

অমল : শালা, সংসার তো আর করলে না চাঁদ!

রঞ্জন : আরে চুপ কর চুপ কর। দালালের আবার সংসার কি রে?

অমল : সংসারে কোন তালব্য শ দালাল নয় রে? তাঁহা তাঁহা মহাপুরুষ থেকে শুরু করে আদার বেপারী পর্যন্ত কোন বেটা দালাল নয়, বলতে পারিস?

রঞ্জন : ও, রামকৃষ্ণ, তৈলঙ্গস্বামী, চৈতন্য, বুদ্ধ, এঁরা সব দালাল, কেমন?

অমল : আলবাৎ দালাল। গোটা আধ্যাত্মিক দুনিয়ার ঠিকেদারি নিয়ে বসে আছে আর বলছিস দালাল নয়!

রঞ্জন : বাঃ!

অমল : বাঃ?

রঞ্জন : তা একাকার করছিস কেন রে মুক্ষু। তাঁদের দুনিয়া আর তোর দুনিয়া কি এক?

অমল : এক এক, ও সব এক। তুই শালা communal minded তাই ভাগাভাগি করছিস। বর্তমান democratic set up-এ তোকে থাকতে দেওয়াই উচিত নয়।

রঙ্গন : [ঘড়ি দেখে লাফিয়ে ওঠে] রাত সাড়ে দশটার পর অবশ্যই নয়।

অমল : আরে বোস না বোস না, কথা আছে।

রঞ্জন : বাকিটা বউকে বলিস।…আচ্ছা, তা হলে ঐ কথা রইলো!

অমল : কার সঙ্গে কি কথা? আমি জানতে পাবো না?

[লতা রঞ্জনকে এগিয়ে দিতে যায়]

রঞ্জন : আজ্ঞে না।

অমল : This is bad Ranjan I should say. আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে গোপনে শলা আর পরামর্শ… [লতাকে উদ্দেশ্য করে] দ্যাখো দ্যাখো, আবার তুমিও এগিয়ে চল্লে?—যাচ্চলে!

রঞ্জন : আচ্ছা চলি রে।

অমল : আয়।…

[টিপয়ের ওপরে পড়ে থাকা সিগারেটের খালি প্যাকেটটা তুলে]

…এটা আবার কি ? কোষ্ঠীর ছক ! রঞ্জন রায়ের নাকি ?

[বিদায় জানিয়ে লতা ঘুরে আসে ইতিমধ্যে]

…আচ্ছা লতা !

লতা : উঁ।

অমল : আমাদের রাজজোটক ছিল, না ?

লতা : কেন বল তো ?

অমল : এমনিই জিজ্ঞেস করছিলাম।

লতা : এমনিই ?

অমল : রঞ্জন তোমাকে বলছিল কিছু ?—এই টাকাকড়ির কথা ?

লতা : টাকাকড়ির কথা !

অমল : আহা কুঞ্জলালের মত রঞ্জনও তো আমার একজন বড়ো পাওনাদার। ইদানীং যে রকম ভাব জমাচ্ছে এসে, তাই ভাবছিলাম রঞ্জন আবার এই সময়টা তার টাকাকড়ি চেয়ে না বসে।

লতা : রঞ্জনকে তুমি চেনো নি। রঞ্জন সে ধরনের ছেলেই নয়।

অমল : ছেলে নয় ছেলে হতে কতক্ষণ ? এরা হচ্ছে জাত ব্যবসায়ীর ছেলে। রক্তে রক্তে এদের টাকা আনা পাই।

লতা : তুমি এ কথা বলতে পারো না অমল। রঞ্জন নাকি যা করেছে তোমার জন্যে, ছিঃ !

অমল : একেবারে ছিঃ হয়ে গেলাম, এর মধ্যেই ?

লতা : ভাই বন্ধু অনেকেই তো ছিল। কই, কেউ তো এসে জিজ্ঞেসাও করে নি ডেকে।

অমল : না, কেউ আসে নি কেউ ডাকে নি। কিন্তু তাতে করে রঞ্জন রায় সম্পর্কে তোমার এতটা sympathetic হয়ে ওঠবার কারণ কি লতা ? টাকা তুমি কি মনে করো সে একদিন উশুল করে নেবে না ?

লতা : নিলেও গলায় আঙুল দিয়ে কক্ষনো না। He is above such meanness. কি ভালো ! এতটুকু অহংকার নেই…

অমল : সমস্ত অহংকার বুঝি ইতিমধ্যেই সে চূর্ণ করে বসে আছে তোমার কাছে ? জানতাম না তো ?

লতা : তোমার মন জানলে বড্ড ছোট, অত্যন্ত নীচ।

অমল : তাতে করে তোমার মহাপ্রাণ হতে বাধা কোথায় লতা !

লতা : ছিঃ, আমি যদি কক্ষনো আর…। তোমার জন্যে আমি…

অমল : আরে কি আশ্চর্য, আমি ঠাট্টা করছিলাম। লতা !

লতা : সব কথা ঠাট্টা হয় না, জানো !

অমল : লক্ষীটি, রাগ করো না। তুমিই তো আমার সব। শুধু তো সহধর্মিনীই নও, সহমর্মিনীও বটে। তুমি চটে গেলে…। ছিঃ ! (আদর করে) ভালো কথা, টাকার কিছু হিল্লে করতে পারলে ?

লতা : না।

অমল : স্বামীর বিপদে না বলছো হিঁদু ঘরের তুমি কেমন বউ লতা ! দেড় লাখের অন্তত পঁচাত্তর হাজারের ব্যবস্থা করো যে করে পারো !

লতা : রঞ্জনের মতো ছেলে হয় না।

অমল : কুঞ্জলালের মতোও মানুষ হয় না। শুধু একটিবার, একটিবার যদি তুমি তাকে চিনতে। তা তুমি তো একবারও গেলে না !

[লতা ঘুরে তাকায় অমলের দিকে। স্বামীকে দেখে। অমল মুখ ঘুরিয়ে দেখে বিশ্বসংসার—ঠিক দালাল যেমন দেখে।]

পর্দা

চতুর্থ দৃশ্য

[সোফা সেটির কভার পাল্টে, ঝাড় পোঁছ করে ড্রইংরুমখানাকে সম্ভবমতো আরও সুদৃশ্য করে তুলছে ভৃত্যগণ সুহাস-এর নির্দেশমতো। হাতে হাতে কাজ চলছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যালান্স করে ঘর সাজাচ্ছেন সুহাস এটা টেনে, সেটা সরিয়ে।]

সুহাস : [ভৃত্যকে] দাঁড়িয়ে রইলি কেনো কাঠপুতলির মতো। গদিগুলো এইবার ঠিক করে বসিয়ে দে।…নড়তেচড়তে বারোমাস।…

[স্বগত] এখনও মালী ফুল দিয়ে গেল না।…'বোল'-এর জলটা পাল্টে দিবি মনে করে।…ছ'টার পর থেকে সব্বাই যেন হাজির থেকো, ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করতে না হয়।

জনৈক ভৃত্য : বড়োসাহেব ফোন করছেন।

সুহাস : লাইনটা দিতে বল। এখন আমি সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতে পারব না।…

[চাকর লাইন দিয়ে যায়]

[স্বগত]…বীরু খবরটা পেলো কি না জানতেই পারলাম না। ফোন করে যে একটা খবরবার্তা নেবে!…ছবি কিছু এবার আমায় কিনতেই হবে।…

[চাকর রিসিভার এগিয়ে দেয়]

Hallo, কথা কইছি। কে, শঙ্খ? কি বল! কি? স্পষ্ট করে বল বাপু শুনতে পাচ্ছি নে।—হ্যাঁ তোর টেবিলে হো হো করে হাসছেন যে ভদ্দরলোক তাঁকে থামতে বল না!…হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ সে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। অভ্যর্থনায় কোনো ত্রুটি না হয়—সেই জন্যেই তো মরে মরে সব ব্যবস্থা করলুম। কটায়? সাড়ে সাতটা? আজ একটু সকাল সকালই আয় না। হ্যাঁ তা বৌমাকে একটু তাড়াতাড়ি বেরুতে বলো, সেজেগুজে বেরুতে আবার দেরি না করেন। মনে রেখো বোনের বিয়ে দিচ্ছো। [ফোন রেখে দেন] দায়টা দেখছি আমারই।…

[রিসিভার রেখে দেন]

[ভৃত্যগণের প্রস্থান]

…কোনোমতে দায়টা উদ্ধার হলে বাঁচি। কারু তোয়াক্কা করব না।…কথা শুনলে গা জলে যায়।—বৌমা গাড়ি নিয়ে অফিস থেকে ওঁকে তুলে আনবেন! যত সব বিবিয়ানা। কেন বাপু, তুমি তো শুনি অফিসার লোক, তোমার মাথার ওপর কথা কইবার লোক নেই। একটি দিনের জন্যে তুমি একটু আগে থাকতে আসতে পারো না? সব সাহেব হয়েছে!

[কথার মাঝখানে রসময়ের প্রবেশ]

রসময় : ইংরেজ আমলে আমরা ছিলাম সব মোসাহেব। এখন ইংরেজের অবর্তমানে আমরা হইছি 'সাব',—সব সাহেব।

সুহাস : আহা, তুমি আবার সাহেব ছিলে কবে। করতে তো গুরুগিরি, তখনও, এখনও। কলেজে ছাত্তর পড়াও।

রসময় : আহা গৌরবে বহুবচন, বোঝ না কেন? ছেলেরা তো তোমার সব সাহেব।

সুহাস : হ্যাঁ, বাঘের বেটা সব চিতেবাঘ। সব বউ-এর মুখ চেয়ে আছে। বউ কি বলে! ছ্যা ছ্যা, ব্যক্তিত্ব সব বাইরে। ভেতরে সব মেনীমুখো।

রসময় : কি করবে!

সুহাস : কেন, আর কোনো কর্তব্য নেই সংসারে?

রসময় : তোমার অতিথি-আপ্যায়নের তোড়জোড় শেষ হয়েছে? রঞ্জনের বাবা না কে যেন আসবেন বাড়িতে আজ শুনছিলাম।

সুহাস : না, রঞ্জনের বাবাই আসছেন। দেখো, বিজ্ঞানীদের আবার ভুলো মন। কাকা কি মামা বলে বসো না যেন মহীতোষ রায়কে।

রসময় : কিছু ফুল রাখতে পারতে।

সুহাস : ঐ তো বড়ো বৌমা নাকি মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে নিয়ে আসবেন ফুল আসবার পথে। বল্লুম দেরি হয়ে যাবে…যাই আবার ছুট করে হয়তো এসে পড়বেনখন। তৈরি হয়ে নিই গে।

রসময় : আহা দেখতে আসছেন তো কল্যাণীকে।

সুহাস : হ্যাঁ,—ছি। তুমি জামাকাপড় ছাড়ো।

রসময় : কেন, this is quite respectable.

সুহাস : মনে রেখো, মেয়ের বিয়ে দিচ্ছো।…

[সুহাস-এর প্রস্থান]

[রসময় বুককেস থেকে একখানা বই উল্টেপাল্টে দেখেন]

রসময় : ইট-কাঠ-এর সঙ্গে কথা কইছি।

[চাকর এসে ফুল রেখে যায় ফুলদানিতে]

[স্বগত] Yes, the problem is to change it—at all times, in all ages.

[নেপথ্যে গাড়ির হর্ন-এর শব্দ। আস্তে থেকে জোরে একটানা বেজে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় হর্ন। উর্দিপরা চাকর বেয়ারাদের মধ্যে মঞ্চের গভীরে চাঞ্চল্য দেখা যায়। সসম্ভ্রম অভিবাদন জানিয়ে তাদের সরে সরে দাঁড়ানোর সঙ্গে দেখা যায় মহীতোষ রায়কে। ষাট বছরের কাছাকাছি বয়েস। সম্ভ্রান্ত উজ্জ্বল চেহারা। ধীর গম্ভীর। পরনে প্রিন্সকোট আর প্যান্ট। হাতে লাঠি। শশব্যস্তে এগিয়ে যান রসময় অভ্যর্থনা জানাতে।]

মহীতোষ : [রসময়কে] আপনি নিশ্চয়ই কল্যাণীর বাবা হবেন !

রসময় : বসুন, বসুন !

মহীতোষ : আপনি ব্যস্ত হবেন না আমি বসছি।…আপনি বসুন।

রসময় : বাড়ি চিনে আসতে অসুবিধে হয় নি !

মহীতোষ : না কিচ্ছু না। ড্রাইভার তো দেখলাম ঠিকই নিয়ে এলো।

রসময় : হ্যাঁ রঞ্জন তো প্রায়ই আসেন।

মহীতোষ : রঞ্জন তো এখন আপনাদেরই ঘরের ছেলে। বাড়িতে আর কতক্ষণ! দিনেরবেলা তো দেখাসাক্ষাৎই হয় না। রাত্রে খাবার টেবিলে ইদানিং যদিবা দেখা হয় তো বলে, কল্যাণীদের বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি। বুড়োবুড়ি আমাদের অবিশ্যি একটুখানি ফাঁকা ফাঁকা লাগে ; কিন্তু উপায় নেই !

রসময় : তা তো লাগবারই কথা। দিনান্তে দেখাসাক্ষাৎও তো যা হবার হয় ওই সময়টাতেই।

মহীতোষ : ঐ সময়টাতেই। বাদবাকি অন্য সময়ের সবটুকুই তো বাইরে বাইরে ;—অফিস, ক্লাব, ব্যস্।…এখন কথা হচ্ছে আমাদের তো একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে !

রসময় : তা তো বটেই, তা তো বটেই।

মহীতোষ : আমার তবু চলে যায়। কাজকর্ম ছাড়া বুড়োবয়সে ছ-দশটা বাতিক করে রেখেছি।……ওঁরই হয়েছে একটু অসুবিধে। সেকেলে ধরনের মানুষ, সোসাইটি-টোসাইটিও সেরকম পছন্দ করেন না। এখন হয়েছে শুধু ছেলের বউ ; ছেলের বউ না হলে আর মন টিঁকছে না।

রসময় : তা তো হবেই ! আর ওই তো একমাত্র ছেলে…

মহীতোষ : হ্যাঁ তা একমাত্রই বলতে পারেন। আগপক্ষের ছেলেমেয়ের সঙ্গে practically আমার কোনো সম্পর্কই নেই। ব্যাপারটা তাহলে একটু খুলেই বলি, They have disowned me, just the reverse. অথচ আমি কিন্তু কস্মিনকালেও তাদের ত্যাজ্য করি নি ; যদিও তারা অবিশ্যি সেই কথাই বলে বেড়ায় শুনতে পাই।

রসময় : রঞ্জন তাহলে আপনার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান।

মহীতোষ : আজ্ঞে দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান।…বাপের টাকা থাকলে যা হয় আর কি !—তাঁরা মনে করলেন সৎমা আর সৎভাই মিলে তাঁদের সব বঞ্চিত করবে।—The same old stinky story. আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের সম্বন্ধ করতে চলিছি, তাই কিছুটা অন্তত আপনার কাছে আমার পরিষ্কার করে বলা দরকার।

রসময় : না, তাতে আর কি হয়েছে।…এখন কথা হচ্ছে যে এই বিবাহের ঘটনাটি সম্পর্কে আমি কিন্তু আদৌ জ্ঞাত ছিলাম না। সম্প্রতি বাড়ির তরফ থেকে আমাকে জানানো হয়েছে।

মহীতোষ : অ। আপনি বলছেন আপনি জানতেন না কিছু।

রসময় : আজ্ঞে না।

মহীতোষ : বুঝলাম।

রসময় : আর সত্যি কথা বলতে গেলে ছেলেমেয়েদের এই বিবাহাদির ব্যাপারে আমার তো কোনো ব্যক্তিগত মতামত নেই। মতামত থাকতেও পারে না। আগেও সে মতামত কোনোদিন exert করি নি, এখনও করি না। লেখাপড়া শিখেছে, ভালোমন্দ বুঝতে পারছে…কল্যাণী আপনার এই একুশ পেরিয়ে বাইশে পড়লো। ওরাই সব করে, তবে আমার শুধু একটা His majestys ratification—নাম দস্তখত, that I always do with a smiling face.

মহীতোষ : এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত রসময়বাবু। তবু আমি এলাম, রঞ্জন আমার একমাত্র সন্তান, আপনার মেয়েকে সে ভালোবাসে…

রসময় : না না আপনি এসেছেন, সে তো আমার সৌভাগ্য।

মহীতোষ : সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের কথা কেউ-ই বলতে পারে না রসময়বাবু। ও ভবিতব্যে যা হবার তা হবেই। নইলে দেখুন ছেলের বিয়ে দেবো আমি, যাগ গে···। প্রস্তাবটা আমি আশা করেছিলাম মুখ্যতঃ আপনাদের তরফ থেকেই আসবে। কেন না usually এই সব সামাজিক ব্যাপারে তাই হয়।

রসময় : আপনি ভুল করছেন মহীতোষবাবু। আমি তো আপনাকে পূর্বেই বলেছি···

মহীতোষ : হ্যাঁ আপনি তো বল্লেন আপনি জানতেনই না ব্যাপারটা।

রসময় : বিন্দুবিসর্গ না।

মহীতোষ : উঁ।···এখন ঘটনা যাই হোক, ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, লাখকথা না হলে শুনি আমাদের দেশে ছেলেপুলেদের বিয়েথা হয় না। কিন্তু আমার ছেলের বিয়ের ব্যাপারে আমি তো আপনাকে লাখকথা বলতে পারব না রসময়বাবু।

রসময় : এই দেখুন আপনি অযথা ক্ষুণ্ণ হচ্ছেন। মেয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে আমি একটু কথাবার্তা কয়ে দেখি।

মহীতোষ : তারপর বিয়েথা হলে হবে, আর নইলে হবে না, এই তো!

রসময় : না মানে, আপনি হয়তো আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছেন না রায়মশাই।

মহীতোষ : আমি ঠিকই বুঝেছি।···আচ্ছা চলি, নমস্কার!

রসময় : নমস্কার।

[মহীতোষ রায়ের দ্রুত নিষ্ক্রমণ ও সুহাস-এর প্রবেশ]

সুহাস : কি হলো! মিঃ রায় চলে গেলেন?

রসময় : দেখলেই তো চলে গেলেন।

সুহাস : ওমা, এই এলেন, চলে গেলেন, কি হলো?

রসময় : শুধু গেলেন না, বেশ ক্ষুণ্ণ হয়ে গেলেন মনে হলো।

সুহাস : কেন?

রসময় : কেন তা তিনিই জানেন।

সুহাস : আমি জানতুম! এই জন্যেই আমি কংশ-কে আগে থেকে

পই পই করে বল্লুম বলি যে ছাখ্, অফিশ থেকে আজ একটু তাড়াতাড়ি আসিস; ছি ছি ছি ছি ছি ছি।···

[কংশ ও পশ্চাতে তার স্ত্রী অ্যানির প্রবেশ]

কংশ : [স্ত্রীকে] কই এসো! [সুহাসকে] কি ব্যাপার, মা! মিঃ রায় এখনও আসেন নি?

সুহাস : তোমরাই দেখালে বাবা। সেই আসা এলে···

কংশ : (ঘড়ি দেখে) Just half past six. ঠিক সাড়ে ছ'টা। সে কথা আমি তোমাকে তো ফোনেই বল্লুম।

সুহাস : না চল তোমরা ঠিক কাঁটায় কাঁটায় জানি। ছি ছি ছি ছি।

অ্যানি : তুমি তো আমাকে সাড়ে ছয়টা বলেছিলে!

কংশ : oh yes!

সুহাস : তা তো বুঝলাম yes, কিন্তু এদিকে যে সব কেলেঙ্কারী হয়ে গেল!

অ্যানি : [কংশকে] Anything wrong?

কংশ : [সুহাসকে] মিঃ রায় এখনও আসেন নি, এই তো? কাজের মানুষ হয়তো দেরি হচ্ছে। এক্ষুনি এসে পড়বেন আর কি। I know he will come.

রসময় : না না, he will not come. তিনি এসেছিলেন কিন্তু যে কারণেই হোক, he felt offended and walked out.

কংশ : Walked out! কারণ?

রসময় : কারণ কি এখন সে কথার উত্তর দেওয়া তো আমার পক্ষে মুশকিল। এক হতে পারে রঞ্জনের সঙ্গে কল্যাণীর বিবাহের প্রস্তাব মাত্র-ই কেন আমি কৃতকৃতার্থ হয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ি নি, এই;—আর কি হতে পারে!

সুহাস : শোনো কথা। শুনলে তো?···তুমি নিশ্চয়ই বাদ সেধেছিলে আমি বলবো। নইলে তাঁর মতো একজন মানী লোক উবজে বাড়ি বয়ে এসে কখনও মনক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে যান! কি কথায় যেন কি কথা বলেছিলে! কি করে জানবো!

কংশ : যাগ গে আমি এতক্ষণে সব বুঝতে পারছি। বাবার তো ও-সব আছেই। তবে এ কথাও আমি আপনাকে বলছি বাবা যে রঞ্জনের চাইতে যোগ্য পাত্র আপনি বাংলাদেশে পাবেন না।

সুহাস : [রসময়কে] আহা কি তোমার মেয়ে! অমন মেয়ে যেন মানুষের হয় না!

রসময় : নাঃ, অসম্ভব হলো বসে থাকা এখানে।

[মেজ ছেলে ইঞ্জিনিয়ার বীরেশের প্রবেশ]

বীরেশ : [বসে] তারপর, বৌদি কতক্ষণ?

অ্যানি : কিছুক্ষণ এসেছি।

বীরেশ : আচ্ছা। তা সব চুপচাপ। সাংসারিক কোনো কিছু···

কংশ : মিঃ রায় ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেছেন বীরু।

বীরেশ : অ, But why at all ক্ষুণ্ণ?

কংশ : কি বাবার সঙ্গে মতান্তর হয়েছিল।

রসময় : মতান্তর নয়, কথান্তর হয়েছিল মাত্র।

কংশ : কথান্তর হয়েছিল।

সুহাস : দু মিনিট এলেন না এলেন তাঁর মতো একজন গণ্যমান্য লোক,—তার সঙ্গে মতান্তর হলো, কথান্তর হলো, আমার বাপু মগজেই ঢুকছে না।

কংশ : আমারও না।

বীরেশ : তবু তো দেখছি তোমরা সব্বাই বোঝবার চেষ্টা করছো।

সুহাস : কেলেঙ্কারী, কেলেঙ্কারী!

[ছোট ছেলে Entrepremur,—দালাল অমল-এর প্রবেশ]

অমল : দাদা কতক্ষণ!

কংশ : তা বেশ কিছুক্ষণ।

অমল : [বীরেশকে] মেজদা!

বীরেশ : কই, তুমি তো খুব এলে!

অমল : তিন দিন হলো গাড়িটা বিগড়ে রয়েছে।

বীরেশ : I could send you my car. জানালে না কেন?

অমল : আর তা ছাড়া ব্যস্তও ছিলাম। year closing-এর সময়। outstanding billগুলো সব পড়ে আছে গবর্নমেন্টের ঘরে। টাকা বের করা সে এক অসম্ভব ব্যাপার [কংশকে] কই দাদা তোমার সেই Mr. Dey কিন্তু আমাকে কিছু সাহায্য করছেন না।

কংশ : কি বলে?

অমল : কিছু বল্লে তো বুঝতেই পারতুম। আমার পক্ষেও সুবিধে হতো কাজের।—ধন্নাই দিচ্ছি ধন্নাই দিচ্ছি, রা বাক্যি নেই ভদ্দরলোকের মুখে। কি রে বাবা!

কংশ : লোকটাই একটু ঐ প্রকৃতির। কথা বলে কম। তবে attend করে যাও। ছেড়ো না।

অমল : দেবো নাকি dose!

কংশ : ঐটি-ই করো না। তা হলেই সব কেঁচে যাবে।

অমল : X' mas day-তে কেমন কড়া তত্ত্বটি পাঠালাম, তা বুঝি জানো না?

কংশ : না।

অমল : ওঃ, সে জানলে দাদা, যেন জামাইতত্ত্ব করছি। By air ফুল আনালুম দার্জিলিং থেকে। পড়বি তো পড় ঠিক সেই সময়েই আবার পড়লো গিয়ে তোমার সাহেবের ছেলের বিয়ে। তোলারাম মাঙ্নীরাম-এর দোকান থেকে সাত শ' চল্লিশের একখানা জড়োয়ার নেকলেস্ দিয়ে মুখ দেখে এলাম নববধূর···

বীরেশ : তবে তো মেরে দিয়েছো হে।

অমল : বলছো, কিন্তু বিল তো একখানাও পাশ করল না আজ পর্যন্ত। আমিও জোর দিচ্ছি না। টেণ্ডার আর টেণ্ডার-ই পাঠাচ্ছি নতুন বছরের। মা কালীর দয়ায় military supply-টা একবার পেয়ে যাই; মা মা মা···[মা কালীর উদ্দেশ্যে যুক্তকর কপালে ঠেকায়। হঠাৎ সুহাসের প্রতি] তুমি কেন কথা কইছো না মা!···কি ব্যাপার! [বীরেশকে] একটু stiff মনে হচ্ছে আবহাওয়াটা। বড়দা! আজকে না রঞ্জনের বাবার আসবার কথা ছিল! what happened with that big guy?

বীরেশ : Big guy turned out to be very small here and went away offended.

অমল : মানে?

বীরেশ : আমি আর কিছু জানি না। So goes the report.

অমল : ব্যাপার কি মা?

সুহাস : ব্যাপার আর কি?—ওঁর সঙ্গে নাকি বিয়েথা-র ব্যাপার নিয়ে

কথা কাটাকাটি হয়েছে। তাই রাগ করে চলে গেছেন মিঃ রায়।

অমল : কি হয়েছে বাবা? বাবা!

রসময় : This is the third time you ask me the very same question. You people will make me mad.

অমল : আমি···আপান কি বলছেন বাবা।

কংশ : অমল, Don't irritate him.

অমল : But why so fuss. তুমিই বলো না মা কি হয়েছে।

রসময় : কিচ্ছু হয় নি, কিচ্ছু বলি নি। বলবার ভেতরে শুদ্ধু বলিছি মেয়ে আমার বড় হয়েছে লেখাপড়া শিখেছে, তার যদি এ বিয়েতে মত থাকে তো তাহলে আমার কোনো বক্তব্যই নেই। বল অন্যায় কিছু বলিছি?

কংশ : অন্যায় তো কেউ-ই বলছে না। আপনি খামখা উত্তেজিত হচ্চেন।

রসময় : না না, আমার পুত্রকন্যা সম্পর্কে আমি যদি এই ধারণা পোষণ করে থাকি যে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপারে ভালোমন্দ যা হোক তারাই বুঝবে, এটা কি আমার পক্ষে অপরাধ? কি তোমরা আমাকে বোঝাতে চাও আমি জানি না। আর এই কথা যেই না বলা অমনি তিনি আমাকে বল্লেন, লাখ কথায় আর যাঁর ছেলেরই বিয়ে হবে হোক, আমি আমার ছেলের বিয়ের ব্যাপারে কারো সঙ্গে একটি ছেড়ে দুটি কথা বলতে পারবো না। এ কোনো ভদ্দরলোকের কথা হতে পারে না।—আমার মেয়ের নাম 'ফ্যালনা' নয়।

বীরেশ : কেউ-ই তো সে কথা বলছে না।

রসময় : বলছে, তাই-ই বলছে।—কান নেই তাই তোমরা শুনতে পাও না, চোখ নেই তাই দেখতে পাও না, প্রাণ নেই তাই অনুভব করতে পারো না। আর নয় তো বুঝতে হবে আমি-ই কালা বোবা হয়ে গেছি, পঞ্চেন্দ্রিয় আমার শিথিল হয়ে গেছে।

সুহাস : ওমা, তুমি যে দেখছি ক্ষেপে উঠলে গা। বলি কেউ কি তা নিয়ে তোমাকে কোনো কথা শুনিয়েছে যে তুমি চেঁচাচ্ছো?

রসময় : শুনতে পেইছি বলেই না চেঁচাচ্ছি। এমনি চেঁচাচ্ছি? [উঠে পড়েন] কথা তুমি শুনতে পাও নি, কথা তুমি শুনতে পারেও

না। বহু কূটস্বার্থ একসঙ্গে জড়িয়ে গেছে, বুঝলে?—হাঁড়িকাঠ, হাঁড়িকাঠ!

বীরেশ : আপনি বড্ড sentimental হয়ে পড়েন বাবা।

[রসময়-এর প্রস্থান]

কংশ : বড্ড hypersensative.

সুহাস : এত অসহ্য হলে চলে?

[কল্যাণীর প্রবেশ]

কল্যাণী : বাড়িতে এত চেঁচামেচি কিসের মা!

কংশ : তুমি-ই তো ঘটাচ্ছো।

কল্যাণী : আমি!

বীরেশ : রঞ্জনের সম্পর্কে তোমার মতামতটা কল্যাণী তুমি আমাদের স্পষ্ট করে জানালেই তো পারো। You know what I mean.

কল্যাণী : রঞ্জন সম্পর্কে আমার মতামত—তোমরা কি বলতে চাচ্ছ দাদা! বিয়ে? রঞ্জনকে আমি বিয়ে করবো কি না?

অমল : Yes, Just that. এবং নাটুকেপনা না করেই আমার মনে হয় তুমি বলতে পারো কথাটা।

কল্যাণী : এই সামান্য বিষয় নিয়ে আমার মনে হয় কোনো নাটক হয় না ছোড়দা।

বীরেশ : ঠিক আছে, ও aesthetics-এর প্রশ্নটা আমরা না হয় Aristotle-এর কাছ থেকেই জেনে নেবখন। আপাততঃ তুমি বলো, and that very unequivocally. রঞ্জন রায়কে তুমি বিয়ে করছো কি?

কল্যাণী : বিয়ে!

বীরেশ : হ্যাঁ।

কল্যাণী : না, কস্মিনকালে না।

অমল : মানে?

কংশ : তার সঙ্গে তোমার এত ভাব, এত মেলামেশা, এ তুমি কি বলছো কল্যাণী!

অমল : মাকে তুমি কি বলেছো?

কল্যানী : বিয়ে করবো কোনোদিন বলি নি।

সুহাস : আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

কল্যাণী : আমি কোনোদিন মা, কি আর কাউকে—রঞ্জন রায়কে বিয়ে করবো—এ কথাটা কক্ষনো বলি নি।

অমল : বলনি অথচ কথাটা হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। ইতিমধ্যে রঞ্জন এ বাড়িতে আসছে, যাচ্ছে…

কল্যাণী : আমি জানি না। আর মেলামেশা করলেই যদি বিয়ে করতে হয়…

কংশ : সামাজিকভাবে তাই হয় কল্যাণী।

কল্যাণী : সমাজ! তুমি বলছো সমাজের কথা দাদা!

কংশ : হ্যাঁ, বলছি।

কল্যাণী : আমাদের আবার সমাজ কি দাদা?

কংশ : Just see. M.A. পাশ করেছো আর তুমি সমাজ চেনো না!

বীরেশ : If I remember, Socioiogy-তে তোমার জানতুম ভয়ানক interest ছিল একদিন কল্যাণী।

কংশ : আমি তোমার কুসংস্কারাচ্ছন্ন পাঁজিপুঁথির সমাজের কথা কিন্তু বলি নি কল্যাণী, I mean the society that abides by the generally accepted norms of the elite society.

কল্যাণী : সেটা ঠিক সমাজ নয় দাদা। সেটা হলো সমাজের ভেতরকার ছোট্ট একটা গোষ্ঠী,—বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে তার কিছুমাত্র যোগাযোগ নেই।

বীরেশ : ও ব্বাবা, তুমি তো তাহলে সবই জানো দেখছি।

কংশ : [কল্যাণীকে] ওটা তোমার ব্যক্তিগত মতামত।

কল্যাণী : না, ব্যক্তিগত নয়। বহুজনের সঙ্গে আমার মতের মিল আছে।

অমল : হ্যাঁ, ইদানীং তুমি দেখছি বড্ড বেশি জেনে ফেলেছো। Anyway, রঞ্জনকে তাহলে তুমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিও কথাটা।

কল্যাণী : আবার তুমি একটা বাজে কথা বকছো ছোড়দা। রঞ্জনকে কেন আমি খামখা সে কথা বলতে যাবো?

অমল : বলবে, কেন না সে অনর্থক একটা ভুল ধারণা করে বসে আছে যে…

কল্যাণী : হ্যাঁ, কিন্তু তার ব্যক্তিগত ভুল ধারণা সংশোধন করবার কোনো দায়িত্বই আমার থাকতে পারে না।

কংশ : অমল, ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও।

[কল্যাণীর দ্রুত প্রস্থান]

সুহাস : এমন বিপদে যেন মানুষ না পড়ে।…বীরু কি রাত্তিরে খেয়ে যাবি?

বীরেশ : আজ না মা। পরশু এসে খাবোখন।

[সুহাসের প্রস্থান]

কংশ : আমি উঠব।

অমল : কি উঠব উঠব করছ দাদা, বসো। কথা আছে।

কংশ : আবার কি কথা!

বীরেশ : শুধুই কথা?

অমল : না আছে। ভালো জিনিস আছে। রাম!

কংশ : নিয়ে এসো, নিয়ে এসো। মেজাজটাই আজ…(ইংরিজি সুর ভাঁজে) রাম!

বীরেশ : রাম!

[ভৃত্য রাম-এর প্রবেশ]

অমল : গেলাস দিয়ে যা।

[রাম-এর প্রস্থান]

বীরেশ : আমি অবিশ্যি একটু চড়িয়েই বেরিয়েছি।

অমল : কি খেলে?

বীরেশ : ঐ, যা হয় একটা হলো। হুইস্কিই হবে হয়তো। কিনতে হবে। ফুরিয়ে গেছে stock.

অমল : তুমি আজকাল বড্ড বেশি খাচ্ছ মেজদা।

বীরেশ : কই, না! ভীষণ কমিয়ে দিইছি। চার পেগ, কি খুব বেশি হলো তো পাঁচ পেগ। তার বেশি খাই না।

[রাম পেগ দিয়ে যায় চেলে]

অমল : বোতলটা রেখে পর্দাগুলো টেনে দিয়ে যা। আর তোর বৌদিকে কিছু খাবার-দাবার দিয়ে যেতে বল।

কংশ : To everybody's health.

[অমল খালি পাত্রগুলি পূর্ণ করে দেয়]

বীরেশ : Fine. হুইস্কি সব সময় 'নীট' খাবে।

অমল : মারামারি করে মাত্র সাত বোতল পেইছি।

কংশ : একটা বোতল দিয়ে দিও তো গাড়িতে।

অমল : আচ্ছা দাদা, ম্যাকফারসন কোম্পানির purchasing officer-এর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে?

কংশ : যথেষ্ট, সেদিনও তো Dinner খেলুম একসঙ্গে।

অমল : তাই নাকি? আর আমি এদিকে এর ওর তার কাছে ঘুরে মরছি খামখা 'কোটেশন' নিয়ে। একটা যোগাযোগ হতে পারে না?

কংশ : গেলেই হতে পারে। Telephone করে একদিন চলে এসো আমার অফিসে lunch-এর আগে।

অমল : ঠিক আছে।

বীরেশ : কই ব্রাদার, ঢালো।

অমল : সে কি, ভরতি করে দিলাম, already emptied.

বীরেশ : দেবে যখন রাজার মতো। কার্পণ্য করো কেন ব্রাদার।

অমল : আহা খাও না তুমি কত খাবে। আমি বলছি একটু রয়ে সয়ে…

বীরেশ : Night is not still young I presume. দাদা, কটা বেজেছে ঘড়িতে।

কংশ : দশটা, দশটা দশ।

বীরেশ : আবার ফিরতে হবে Camp-এ সত্তর মাইল উজিয়ে। রয়ে সয়ে মৌজ করবার সময় কোথায় ভাই!

কংশ : কি জানিস বীরু! সময় সত্যিই খুব সংক্ষেপ। ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে।

বীরেশ : আর আমাদের অবস্থাটা ঠিক সংক্রান্তিরেখায়। Between two edges.

কংশ : And that too very sharp.—যাকে বলে ক্ষুরধার। কি জানিস বীরু…

অমল : আচ্ছা দাদা, ম্যাকফারসন কোম্পানির ভেতরে রায়মশাই-এর কোনো হাত আছে বলতে পারো?

কংশ : রায়বাহাদুর মহীতোষ রায়-এর কথা বলছো?

অমল : হ্যাঁ।

বীরেশ : ছ্যাখ অমল, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, you have grown very selfish these days. দেখছিস দাদা একটা কথা কইছেন…

অমল : Oh I am really sorry মেজদাদা। বলো দাদা তুমি কি বলছিলে।

কংশ : কই কি বলছিলাম! বলছিলাম নাকি? মনে নেই তো!

বীরেশ : হ্যাঁ তুমি যেন একটা কি কথা বলছিলে আমায়। ঠিক বলো নি, সবে শুরু করছিলে আর কি, কি জানিস বীরু! ব্যস্, মাঝখান থেকে অমল অমনি কেটে দিলে কথাটা।

কংশ : কি বলছিলাম, হ্যাঁ, বলছিলাম আর বুঝি সামলাতে পারলুম না। পারতুম, জানিস বীরু, যদি আর মাত্র ছ-মাস সময় পেতাম। মাত্তর ছ-মাস। হুঁঃ! ছ-মাসের জায়গায় সময় পেলাম মাত্তর ছ-দিন।…ঠিক on the 7th day এসে পড়ল Hammerton সাহেব—15th এলো আর on the 3rd day, that is on the 17th call করল Conference. Bombay, Delhi, Madras-এর office representatives-দের special Plane-এ করে চব্বিশ ঘন্টার নোটিশে উড়িয়ে এনে ফেলা হলো কলকাতা—I was then running a risk of twenty five lakhs in cash and goods. তবু ছ-দিনের ভেতরে তিনটে Company খাড়া করে পনোরো লাখ টাকার হিসেব দেখিয়ে দিলাম—but the bloody gulf was as wide as hell—অন্যান্য provincial report তো তখন Hammerton সাহেবের হাতের মধ্যে কি না! কিছুতেই manage করতে পারলাম না! এখন কি যে করব ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। কাকেই বা কি বলি। As it appears, now there is not even an ear to talk to. এক অ্যানি, তাও আবার এত attached wife—this মহীতোষ রায় is a big shareholder in our Company. তাই একটা remote chance নেব ভেবেছিলাম রঞ্জনের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে দিয়ে Mr. Roy-কে কব্জা করে—that too, as it appears, is totally lost. তাই ভাবছি…

অমল : রঞ্জনকে আবার তুমি কেন জড়াচ্ছ দাদা! He has already invested a big lot of money in my firm.

বীরেশ : সেটা আরার কবে? তুমিও রঞ্জনকে···

অমল : কেন করব না মেজদা। কোন তালব্য করে না। টাকা তো লক্ষ্মী। যদি আপসে আসে হাতের মুঠোয় তো বলো ছেড়ে দেব? কেউ দেয়?

বীরেশ : শোধ দিতে পারবে? নিয়েছো তো বুঝলাম।

অমল : প্রশ্ন ওঠে না। রঞ্জন তো আমার পার্টনার!

বীরেশ : আচ্ছা!

অমল : তবে! অমল অতো কাঁচা কাজ করে না, জানলে মেজদা!

বীরেশ : না হলে বলব অবশ্যই creditable.

কংশ : কত টাকা invest করিয়েছ তুমি রঞ্জনকে দিয়ে বল্লে!

অমল : শুধু রঞ্জন নয়, রঞ্জনের মা মিসেস রায়ও এর ভেতরে আছেন।

কংশ : সত্যি!

[বীরেশ গান করে]

···শুনতে পাচ্ছ বীরেশ! (অমলকে) আচ্ছা অমল, মিসেস রায়ের টাকাটা তুমি আমাকে পাইয়ে দাও না। সব টাকাটা তো আর এখনই তোমার দরকার হচ্ছে না! কমিশন-এর পারসেন্টেজ আমি তোমার অনেক বাড়িয়ে দেবো। অমল! লক্ষ্মী ভাই আমার!···

অমল : তা কি করে হয় দাদা!

[বীরেশ জোরে গান করে]

কংশ : তুমি বুঝতে পারছ না অমল, I am in a pit.

অমল : বুঝতে পাচ্ছি সবই কিন্তু তুমি আমাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করো না দাদা। এ হতে পারে না। প্রথমত এ হয় না, দ্বিতীয়ত মিসেস রায় তাতে করে রাজি হবেন না।

কংশ : How does it come to Mrs. Roy's knowledge. তিনি জানবেন কেমন করে?

অমল : না সে অসম্ভব দাদা। তুমি আমাকে অনুরোধ করো না।

ছোটোবেলায় তুমিই তো আমাকে বলতে দাদা, Every one has got to fight his own battle.

কংশ : হ্যাঁ বলতুম, কিন্তু this can be as well your battle অমল। তুমি আমার ছোটো ভাই—আমরা এক মায়ের পেটের সন্তান—we owe our allegiance to our common father.

অমল : সব সত্যি, সবই জানি দাদা। কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না টাকা···

বীরেশ : Bravo Brother, ঠিক বলেছ, জিনিসটা যে টাকা, টাকা কখনও দেওয়া যায়! দাদা, দাদাটা একটা ইয়ে!

কংশ : আমার বিপদের মাত্রাটা তুমি আন্দাজ করতে পারবে না ভাই, তাই···

বীরেশ : বিপদ! হুঁ! সবাই যে যার বিপদের কথা বলো। আর আমি শুধু শুনে যাব—এ-ও এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। বিপদের কথা তুমি আমায় কি বলবে দাদা! তোমার বিপদের তবু তো একটা মাত্রা আছে। আর আমার, আমার বিপদের কোনো মাত্রা-ফাত্রা নেই। অথৈ জলে ডুবে আছে।

অমল : কেন, তোমার আবার বিপদ কি মেজদা! সুখের চাকরি, লাট না হয়েই বড়লাটের মাইনে পাচ্ছ···মেজদার আবার···।

বীরেশ : হ্যাঁ পাচ্ছি। কিন্তু সে মাইনেও আর বেশি দিন পাব না। ওদিকে Dam crack করতে শুরু করেছে।

অমল : কি Dam!

বীরেশ : বিশালাক্ষী Dam.

অমল : দৈর্ঘ্যে পনেরো শ ফিট আর প্রস্থে ধরো কম করে এক শ পঞ্চাশ ফিট···

বীরেশ : না না গোটাটা নয়।

কংশ : বেশ তো, না হয় দু ফার্লংই হলো—দু ফার্লং লম্বা আর চওড়ায় এক শ ফুট, ধর পঁচিশ ফুটই—কত ফুট crack করেছে বল্লে? সে তো বিরাট গর্ত, অনেক টাকা বীরু—you can help me as well.

বীরেশ : কি বলছ কি! তুমি কি আমার হাতে হাতকড়া পরাতে চাও দাদা!

কংশ : ছি ছি, কদর্থ করছ কেন ভাই। ব্যক্তিগত বিপদের কথা আমি তো তোমায় সবই খুলে বল্লাম। বিশ্বাস না করো তুমি তোমার বৌদিকে জিজ্ঞাসা করো।

অ্যানি : বৌদি কি বলবে! বৌদি কি করতে পারে। আমি তখনই তোমাকে বলেছিলাম যেতে দাও তুমি আমাকে West Germany, I should meet Frederich there, তুমি কিছুতে শুনলে না।

অমল : কে ফ্রেডারিক বৌদি?

অ্যানি : The man who counts on such occasion. আমাদের কোম্পানির Managing Director. আমার সাথে তার বন্ধুত্ব আছে—A very fine man.

কংশ : No Ann, no. But then you would be risking yourself.

অ্যানি : That's your own misgiving.

কংশ : না।

অ্যানি : Bloody blood.

কংশ : Ann!

অ্যানি : I will go home at once.

কংশ : Darling!

অ্যানি : Come. Please come. বাড়ি চলো!

কংশ : Yes, to sweet home. Help me Ann....Good night বীরু, Good night অমল।

বীরেশ : Good night.

অ্যানি : Good night everybody.

অমল : Good night.

[অ্যানি ও কংশ-র প্রস্থান]

বীরেশ : চলি ভাই অমল। আমার অনেকটা পথ যেতে হবে।

অমল : যাবে! কিন্তু তোমার সঙ্গে যে আমার অনেক কথা ছিল মেজদা! বলো বাড়িতে যাব?

বীরেশ : না, বাড়িতে আমি থাকি কখন?

অমল : তবে অফিস-এ।

বীরেশ : Construction-এর কাজ চলছে, অফিস তো আমার সঙ্গে সঙ্গে move করছে, অফিস কোথায়? তোমাদের মতো টেবিল-চেয়ারে বসতে পাই!

অমল : তবে! এবার কিন্তু তোমাকে আমায় কিছু টাকা দিতেই হবে।

বীরেশ : বলো তাহলে আর বাড়িতেও আসব না।

অমল : ছি ছি, বাবা মা রয়েছেন আর তুমি বাড়িতে আসবে না মানে!

বীরেশ : তোমার জন্যে শেষ পর্যন্ত আমার বাড়িতে আসাও বন্ধ করতে হবে দেখছি।

অমল : ছি মেজদা, কি যা তা বলছ?

বীরেশ : খুঁচিয়ে ঘা করা তোমার একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। তুমি একজন, বড়দা একজন। একটা কথা বলো তার risk বোঝ না।

অমল : Good night মেজদা!...

[বীরেশ-এর প্রস্থান]

...বেয়ারা! রাম!

[ভৃত্য রাম-এর প্রবেশ]

...পরিষ্কার করে নিয়ে যা। ...আর দিদিমণি, শুয়ে পড়েছে না জেগে আছে?—হয়তো পাঠিয়ে দিস একবার।

[সোফায় এলিয়ে পড়ে]

[রাম-এর প্রস্থান ও লতা-র প্রবেশ]

লতা : বাব্বা, ভাঙল সভা?

অমল : লতা! বসো। আমি ভাবলাম তুমি বুঝি ঘুমিয়েই পড়েছ।

লতা : তোমাদের জ্বালায় আবার ঘুমোবার যো আছে? নিজেরা কানে শুনতে পাচ্ছিলে না তাই, নইলে বুঝতে যে সে কী হট্টগোল আর চেল্লাচিল্লি। বীরদা বুঝি তোমায় শাসন করছিলেন?

অমল : শাসন করছিলেন, আমাকে! কই না।

লতা : কি জানি, সেই রকমই তো মনে হচ্ছিল। যে রকম ধমকে ধমকে কথা কইছিলেন!

অমল : না ও কিঞ্চিৎ পান করবার পর accent-এ কিঞ্চিৎ গণ্ডগোল হচ্ছিল।

লতা : গণ্ডগোল তো সব জায়গায়। রায়মশাই-এর ব্যাপার শুনলাম এসে। অত্যন্ত unfortunate.

অমল : Crazy ব্যাপার।

লতা : তারপর অ্যানির কাছে বড়দার ব্যাপারটাও শুনলাম কিছু কিছু। দুঃখু করে সে কত কথাই না কইছিল। সত্যি কি হবে বলো তো যদি এমন তেমন হয়।

অমল : ব্যাপার অবিশ্যি no doubt complicated. তবে এ সব তো অ্যানির জন্যেই। ইচ্ছে করলে সে আগে থাকতে বড়দাকে সামলে দিতে পারত না মনে করো? অত fast life lead করবার কোনো মানে হয়! আজ দুঃখু করলে কি হবে!

লতা : বলছিল ছোটঠাকুরপো যদি এই সময়টা···

অমল : জানি অ্যানি সেই কথাই বলবে। মানুষটা বিলিতি হলে কি হবে; চরিত্তিরটি একেবারে খেঁদি পেঁচির ছাঁচে ঢালা। আগে থাকতে ঠিক গাইতে সুরু করেছে। ছোট ঠাকুরপোর গাছ আছে টাকার।···এদিকে রায়মশাইকে বিগড়ে দিয়ে কত্তা আবার এক situation করে বসে আছেন। ভাবছি রঞ্জন আবার ইতিমধ্যে টাকা-ফাকা না demand করে বসে। অবিশ্যি অমল গুপ্তর ঠেঙে টাকা বার করা সহজ হবে না, investment is investment—কিন্তু business relation তো খারাপ হয়ে গেল। ···principle দেখাচ্ছেন সব। আরে সংসারে যারা weak, তারাই principle-এর কথা বলে। সক্ষম যে, যার ক্ষমতা আছে, তারা principle নিয়ে মাথা ঘামায়-না। they smiply get things done.. And that is their principle. ও জ্ঞানের কথা আমি অনেক শুনিছি। আমি ঠেকে পড়লে কেউ আমাকে দেবে বল্লে!

লতা : কাউকে তো কিচ্ছু বলবার দরকার নেই। নিজের হিম্মতে দাঁড়িয়েছ, নিজের বুদ্ধিতে কাজ করে যাবে।

অমল : হ্যাঁ, কাজ, কাজই করতে হবে, কাজই করবার আছে। By the

by শ্বশুরমশাইকে টাকার কথা কিছু বলেছিলে? ও ছাখো সার্কুলার রোডের বাড়ি দেবেন, চা বাগানের শেয়ার দেবেন, ও সব হলো ভবিতব্যের কথা। বর্তমানে আমি হাতে কি পাচ্ছি! কিছু পাচ্ছি কি? না পাচ্ছি না?

লতা : ও তো ঘরের টাকা। তুমি চাইলেই পেতে পারো।

অমল : কি ঘরের টাকা! আমার বাবার টাকা আমার না, তার আবার শ্বশুরের!···

[লতা সকৌতুকে পেটকোমর থেকে একটা ব্যাগ বার করে টেনে আনে]

···কি ওটা?

লতা : টাকা।

অমল : টাকা!

লতা : ছাখো না, একেবারে ভরতি সোনাদানায়। টাকা টাকা করছিলে না

[উপুড় করে ঢেলে দেয়]

অমল : মানে!

লতা : মানে বাবার বীমা কোম্পানী ফেল পড়েছে। কোম্পানীর ঘরে চল্লিশ লাখ টাকার কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। বুঝতে পারলে। সে সাংঘাতিক গণ্ডগোল।

অমল : হরিবোল হরিবোল।

লতা : ছিঃ!

অমল : কি! তারপর?

লতা : তারপর আর কি! ঘরে টাকা সোনা যা ছিল সব গচ্ছিত রেখে গেছেন তোমার কাছে। বল্লেন, আমার এখন কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। অমলকে তুমি সব বুঝিয়ে বোলো। আমি দিল্লী চলে যাচ্ছি রাত্তিরের প্লেনে।

অমল : এ সবই তো দেখছি বুলিয়ন, সোনার বার!

লতা : টাকা আর টাকা—এবার তো নিজেই আগা খাঁ।

অমল : তবে তো আমি রাজা হে।

লতা : আর আমি?

অমল : বলো।

লতা : তুমি বলো।

অমল : রানী।···

[হঠাৎ চমকে ওঠে ওরা কোনো একটা শব্দ শুনে]

···কে ?

লতা : কে !

অমল : কেউ না।

লতা : ধরো।

অমল : চলো।

[ঐশ্বর্যের পেটিকা ওরা জড়াজড়ি ধরাধরি করে নিয়ে যায়]

অন্ধকারে পটক্ষেপ

[ক্রমশঃ

ভ্রম সংশোধন

জ্যৈষ্ঠসংখ্যায় কতগুলি গুরুতর মুদ্রণপ্রমাদ থেকে গেছে। ১২৩০ পৃষ্ঠার পাদটীকায় শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় স্থলে শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পড়তে হবে।

তাছাড়া ১১৬০ পৃষ্ঠার ২২তম পংক্তির Conceptional স্থলে Conceptnal ; ১১৬১ পৃষ্ঠার ১১তম পংক্তির সমাজন্ত্রী স্থলে সমাজতন্ত্রী , 'লোকায়ত্ত' স্থলে 'লোকায়ত' ; ১১৬৬ পৃষ্ঠার ২য় পংক্তির মঞ্জুরী স্থলে মজুরী ; ১১৭২ পৃষ্ঠার ২৫তম পংক্তির ১৯৪৯ মাত্র এক-পঞ্চমাংশর স্থলে ১৯৪৯ সালে জাতীয় আয়ে শ্রমিকদের অংশ কমে গেছে এক-পঞ্চমাংশ ; ১১৭৫ পৃষ্ঠার ৩য় পংক্তির 'Poner' স্থলে 'Power' ; ১১৮৩ পৃষ্ঠার ৩য় পংক্তির সবিশেষ স্থলে সব শেষের ; ১১৮৯ পৃষ্ঠার ১২তম পংক্তির 'Reinstated' স্থলে 'Revisited' পড়তে হবে।

১২৫৮ পৃষ্ঠার ২য়-৩য় পংক্তির শুদ্ধপাঠ হবে 'রূপকার' সম্প্রদায়ের অমৃতলাল বসু রচিত 'ব্যাপিকা বিদায়'।

বাঙ্গলা 'ফাউস্ত' প্রসঙ্গে

পরিচয় সম্পাদক সমীপেষু

মহাশয়, আপনার পত্রিকার চৈত্রসংখ্যায় 'পুস্তক পরিচয়'-এ শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় গ্যোতে-রচিত মূল জার্মান্ ফাউস্ত হতে অনূদিত আমার বাঙ্গলা ফাউস্ত-এর যে নয় পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা প্রকাশ করেছেন, তাতে একস্থানে 'রাফায়েল'-এর উক্তি নামক আমার ক্ষুদ্র অনুবাদ কবিতা উদ্ধৃত করে জিজ্ঞাসা করেছেন, "এই অনুবাদে গদ্যের বদলে ছন্দ ব্যবহার করিয়াও কানাইবাবু, শেলীর ভাষায়, মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করিতে পারিয়াছেন কি ?" এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমি তাঁকে কয়েকটি বক্তব্য নিবেদন করি। আশা করি, পাঠকবর্গের সুবিচারের খাতিরে এই বক্তব্যগুলি যত শীঘ্র সম্ভব 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত করবেন।

১। নীরেনবাবু রাফাএল-এর উক্তির আমার যে বাঙ্গলা অনুবাদটি আকারে তুলেছেন সেটি আমার গ্রন্থের পরিশিষ্টের প্রথম পৃষ্ঠাতেই বর্জিত হয়ে নূতন প্রকাশিত হয়েছে, যথা :

ভ্রাতৃসম মহাজ্যোতিষ্কগণ
মণ্ডলমাঝে ধ্বনিছে তপন
গানের দ্বন্দ্বে, আগেরি মতন,
আর সমাপিছে অশনির বেগে
বিহিত আপন বিশ্বভ্রমণ !
দেখি এ-দৃশ্য দেবদূতসার
হয় বলীয়ান,
যদিও বোঝে না তত্ত্ব ইহার
অতি গরীয়ান !
কল্পনাতীত সৃজন তোমার
আজো অপূর্ব আদির প্রকার
অতি মহীয়ান !

[ভুলক্রমে পরিশিষ্টে "বর্ণনাতীত" মুদিত হয়েছে, হবে কল্পনাতীত; যা দ্বিতীয় সংস্করণে মুদ্রিত হচ্ছে এবং এখন ধর্তব্য।]

ওঁরই উক্তি থেকে মনে হয় উনি জার্মান্ ভালো জানেন। তাই আমি ওঁকে বিনীত অনুরোধ করি মূলের সঙ্গে এই অনুবাদটি তুলনা করতে,

তাহলে দেখবেন এর ভাবার্থ ও রস মূলের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক। আর যদি একটু দরদ দিয়ে এটি আবৃত্তি করেন তো বুঝবেন, ধ্বনি-ঝঙ্কারেও উভয়ের মিল আছে। আমি নিবেদন করি, জার্মান্ ও ইংরাজি অনেকটা একজাতীয় ভাষা, কিন্তু বাঙ্গলা সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়। তাই এমন ভিন্নজাতীয় ভাষায় মূলের এতটা ধ্বনি-ঝঙ্কার আনাও দুঃসাধ্য। আমি ওঁকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, এই অনুবাদটি বর্জন করে উনি কেন বর্জিত অনুবাদটি বিশ্ববরেণ্য কবি শেলীর কবিতার সঙ্গে তুলনা করলেন ?

২। উনি মূল থেকে মার্গারেত-এর অপূর্ব বিরহগীতিটি নিজে বাঙ্গলায় অনুবাদ করে বেয়ার্ড টেলারসাহেবের অমন সুন্দর ইংরাজি অনুবাদ ও আমার বাঙ্গলা অনুবাদের পাশাপাশি বসিয়ে 'পরিচয়'-এ প্রকাশ করলেন। ইহাই প্রমাণ করে ওঁর বিশ্বাস, উনি জার্মান্ ভালো জানেন। তবে কেন উনি অনুগ্রহ-পূর্বক অন্বয়-সমেত মূল কবিতাও উদ্ধৃত করে তার সঙ্গে আমার অনুবাদটি তুলনা করলেন না ? তাহলে তো পাঠক বিচার করতে পারতেন কোনটি সত্যিই মূলের নিকট এসেছে। উনি তো নিজেই স্বীকার করেছেন আমি ইংরাজি অনুবাদ দ্বারা আদৌ প্রভাবিত হই নি, কারণ আমি জানি, উনিও নিশ্চয় জানেন, অনুবাদ যত ভালোই হোক মূল থেকে কম বেশি সরে যাবেই, বিশেষ করে কবিতাতে।

৩। উনিই আমার ভূমিকা থেকে অনুগ্রহ করে উঠিয়েছেন, "আমি সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করেছি মূল জার্মান্ ফাউস্তের প্রত্যেকটি অংশের অবিকল ভাব সরল ও রসযুক্ত করে প্রকাশ করতে, অবশ্য খাঁটি বাঙ্গলা পদ্ধতিতে।" ওঁকে এর জন্যে ধন্যবাদ জানাই। আর এ-ও ঐ ভূমিকাতে পরিষ্কার করে দিয়েছি এই পদ্ধতিটি কি ? আমি লিখেছি, "সাহিত্যের অনুবাদে, বিশেষ করে ফাউস্তের ন্যায় মহাকাব্যের অনুবাদে বাঙ্গালীর নিজস্ব রসসৃষ্টির প্রণালী কলাকৌশল ও ভঙ্গী অবলম্বন করলেই সে অনুবাদের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ আসবে ও তা রসযুক্ত হবে।" এ-থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় আমি কোনো ইউরোপীয় ছন্দ বা মিলপ্রণালী ইচ্ছাপূর্বকই ব্যবহার করার চেষ্টা করি নি। আমি ওঁকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি তবু কেন উনি আমার অনুবাদ কবিতার ওঁর কথায় "মিল-গ্রন্থন"-এর বাঙ্গলা কবিতা হিসাবে বিচার না করে, জার্মান্ বা ইংরাজি কবিতার সঙ্গে তুলনা করে দোষ ধরলেন ?

উনি বিশ্ববরেণ্য কবি শেলীর যে অনুবাদ-কবিতা উদ্ধৃত করেছেন, তা সত্যই

অপূর্ব। আমি পূর্বে কখনো এটি পড়ি নি, এই প্রথম ওঁর আলোচনায় পড়ে মুগ্ধ হয়েছি আর ওঁকে ধন্যবাদ দেই। কিন্তু উনি যদি এই অনবদ্য অনুবাদ মূলের সঙ্গে তুলনা করেন তো স্পষ্টই দেখবেন কবিবর শেলী মূলের অনেক জার্মান্ শব্দের আক্ষরিক ইংরাজি অনুবাদ ব্যবহার করেন নি। শুধু তাই নয়, গ্যোতের ছন্দও অনুকরণ করেন নি, যদিও সমস্ত ইউরোপীয় ভাষার ছন্দপ্রণালী অনেকটা একজাতীয়। স্পষ্টই বোঝা যায় কবি শেলী মহাকবি গ্যোতের কবিতার ভাব ও রস হৃদয়ঙ্গম করে তা আবার খাঁটি ইংরাজি ছন্দে ও খাঁটি ইংরাজি কবিতায় রূপ দিয়েছেন। তাই এর এমন ধ্বনি-ঝঙ্কার ভাবঘনত্ব ও স্বচ্ছন্দপ্রবাহ ফুটে উঠেছে। আমিও পূর্বের অনুচ্ছেদে এই কথাই নিবেদন করেছি যে ইহাই হল অনুবাদের প্রকৃষ্ট পন্থা।

কিন্তু নীরেনবাবু শেলীর কবিতার যত প্রশংসাই করুন, অনুবাদের এ-পন্থায় বিশ্বাস করেন না। উনি লিখেছেন, "অনুবাদক হিসাবে তাঁহার (অর্থাৎ ফাউস্তের প্রথম ইংরাজি অনুবাদক বেয়ার্ড টেলার-এর) দাবি এই যে ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের ভাষা ও ছন্দ এতই সঙ্গতিপন্ন যে ফাউস্ত-এর মতো কঠিন কাব্যকেও ভাবে, ভাষায়, ছন্দে অবিকলভাবে ও আক্ষরিকভাবে প্রতিবিম্বিত করা মোটেই অসম্ভব নয়। ইহার জন্যে প্রয়োজন অনমনীয় প্রয়াস, যতক্ষণ না লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়।" উনি যখন বেয়ার্ড টেলার-এর অনুবাদের এতই প্রশংসা করেছেন, উনি হয়তো মনে করেন টেলার সাহেব ওঁর উক্ত পন্থায় অনুবাদ রচনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। এখন দেখা যাক, টেলার সাহেব রাফায়েল-এর উক্তির কী অনুবাদ করেছেন :

Raphael : The sun-orb sings, in emulation,
'Mid brother-spheres, his ancient round :
His path predestined through creation
He ends with step of thunder-sound,
The angels from his visage splendid
Draw power whose measure none can say ;
The lofty works, uncomprehended,
Are bright as on the earliest day.

আমি নীরেনবাবুকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, এই অনুবাদে গদ্যের বদলে ছন্দ ব্যবহার করে, এমনকি গ্যোতের ছন্দ ব্যবহার করে, টেলারসাহেব শেলীর কথায়, মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করতে পেরেছেন কি ?

১৫ই জুন, ১৯৬২

কানাইলাল গাঙ্গুলী

কানাইবাবুর পত্র পড়িলাম। প্রথমেই আমার ত্রুটি স্বীকার করিতেছি যে তাঁহার গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে আমি মনোযোগ দিই নাই। তাই রাফায়েল-এর উক্তির যে অংশ আমি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম তাহার সংশোধিত পাঠ আমার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছিল। এখন সেটি পড়িবার পর দেখিতেছি যে প্রথম পাঠের সহিত তাহার কিছু পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু দুই পাঠের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ কানাইবাবু কল্পনা করিয়াছেন তাহার সন্ধান পাইলাম না। কানাইবাবু যে জার্মান ভাষা প্রায় মাতৃভাষারই সমান জানেন, ইহা আমার অজানা ছিল না। সে তুলনায় জার্মান ভাষায় আমার অধিকার যৎসামান্য। আমি এককালে এই ভাষার কিছু চর্চা করিয়াছিলাম এদেশে বসিয়া, কোনো জার্মান শিক্ষকের সহায়তা পাই নাই। এখন অনেকদিনের অনভ্যাসে তাহাতেও প্রচুর মরিচা ধরিয়া গিয়াছে। আমি কবুল করিতে একটুও কুণ্ঠিত নই যে ফাউস্ত আমি পড়িয়াছিলাম ইংরেজি অনুবাদের ও জার্মান অভিধানের উপর নির্ভর করিয়া। তাই কানাইবাবুর অনুবাদ প্রকাশিত হইলে আমি একান্ত আগ্রহে তাহা পড়িতে বসি। ফাউস্ত কাব্য-নাট্যে যে গীতিকবিতার প্রাচুর্য তাহা সকলেরই জানা কথা। আমার নজর তাই প্রথমেই পড়ে সেইদিকে। দেখিলাম কানাইবাবু মূলের গীতিধর্মিতার রূপ বজায় রাখার দিকে যথেষ্ট প্রয়াস করেন নাই। স্তবকগঠন ও মিলগ্রন্থন গীতিধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু তিনি সেগুলিকে বর্জন করিতে কুণ্ঠিত নন। একজন বাঙালী পাঠক হিসাবে এই তথ্যটি অন্য বাঙালী পাঠককে বোঝাইবার জন্যই আমাকে শেলী ও বেয়ার্ড টেলর-এর ইংরেজি অনুবাদকে কাজে লাগাইতে হইয়াছিল। ইহা তর্কাতীত যে শেলীর দৈবাধীন কবিপ্রতিভা বেয়ার্ড টেলর-এর ছিল না। তবুও রাফায়েল-এর উক্তির বেয়ার্ড টেলর কৃত অনুবাদ—আমি যতটুকু বাংলা, ইংরেজি ও জার্মান ভাষা বুঝি—কানাইবাবুর অনুবাদের চেয়ে মূলের নিকটতর। তাঁহার সমগ্র ফাউস্ত-এর দায়িত্বশীল ও কর্তব্যনিষ্ঠ অনুবাদের প্রয়াসকে আমি প্রভূত শ্রদ্ধা করি। ইহার অনুরূপ প্রয়াসই আমি কানাইবাবুর নিকট প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা পাই নাই। তাহার কারণ, তাঁহার অনুবাদপদ্ধতি। "খাঁটি বাঙ্গলাপদ্ধতি" বলিতে, কাব্যানুবাদের ক্ষেত্রে, তিনি কি বুঝিয়াছেন, তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, কাজি নজরুল,

সুধীন্দ্রনাথ প্রভৃতির ছন্দ-প্রতিভার অকৃপণ বর্ষণে বাংলাকাব্যের প্রকাশ-ভঙ্গির উর্বরতা অসাধারণ। চেষ্টা করিলে খাঁটি বাংলা ভাষায় জার্মান ছন্দের প্রতিরূপ অনেকাংশে অবিকৃত রাখা যাইত, ইহাই আমার ধারণা। আমি ছন্দবিশারদ নই, তবুও আলোচ্য অংশের একটি অনুবাদের চেষ্টা করিতেছি :

> গাহিছেন সূর্যদেব, সনাতন সংক্রমণে,
> প্রতিদ্বন্দ্বী তারাদলে সদর্প সঙ্গীত,
> সমাপিয়া আপনার চিরাভ্যস্ত আবর্তনে
> বজ্রের গর্জনসাথে, যথা নির্ধারিত।
> দেবগণ বলদৃপ্ত এ প্রোজ্জ্বল দৃশ্যেতে
> যাহার দ্যোতনা কেহ না পারে মাপিতে,
> সৃষ্টির অচিন্ত্য কীর্তি এ বিপুল বিশ্বেতে
> তেমনই মহিমময় যেমন আদিতে।

কানাইবাবুর নিকট আমার করজোড়ে নিবেদন যে তিনি যেন ভাবিয়া না বসেন যে এই প্রচেষ্টা দিয়া আমি প্রমাণ করিতে চাহিতেছি যে ফাউস্ত-এর অনুবাদে আমি শেলি বা বেয়ার্ড টেলর-এর সমতুল্য। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য কেবল এইটুকু দেখানো যে বাংলাছন্দের সাবলীলতা সম্বন্ধে কানাইবাবুর আস্থা একটু বেশি থাকিলে তাঁহার অনুবাদ মূলের আরো বেশি সমীপবর্তী হইতে পারিত।

মার্গারেত-এর বিরহগীতিটি আমি জার্মান হইতে অনুবাদ করিয়াছিলাম, কানাইবাবুর অনুবাদ আমার মনঃপুত না হওয়ায়। এ ক্ষেত্রেও, সাধারণ বাঙালীপাঠকের সুবিধার জন্য, বেয়ার্ড টেলর-এর অনুবাদ তুলিয়া দিতে হইয়াছিল। আমার পরম সৌভাগ্যের কথা যে এই অনুবাদকে কানাইবাবু "সুন্দর" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আমার বাংলা অনুবাদে কোথায় কোথায় ত্রুটি আছে তাহা দেখাইয়া দিলে আমি উপকৃত হইতাম। আমার অনুবাদ কানাইবাবুর অনুবাদের চেয়ে নিকৃষ্ট হইলেও তাহাতে আমার প্রবন্ধে কানাইবাবুর অনুবাদের প্রতি অবিচার করা হইয়াছিল কি? কারণ, সে অনুবাদটিও তো সম্পূর্ণভাবেই উদ্ধৃত হইয়াছিল।

আমি কলিকাতার বাহিরে থাকায় কানাইবাবুর পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়া গেল। ইহার জন্য আমি দুঃখিত। তিনি যে আমাকে তাঁহার গ্রন্থখানি উপহার পাঠাইয়াছেন, তাহাতে আমি কৃতজ্ঞ।

২৫শে জুন, ১৯৬২ নীরেন্দ্রনাথ রায়

পুস্তক পরিচয়

কাজল। রমেশচন্দ্র সেন। শতাব্দী গ্রন্থ-ভবন। ছ টাকা।

কাজল একটি মেয়ের নাম। ফুল্লশ্রী নদীর ধারে এক গ্রাম, সেইখানে থাকত। গরীব গেরস্ত ঘরের মেয়ে। "উন্মুক্ত আকাশ, সবুজ গাছপালা, নদীর স্নিগ্ধ জল, মাঠের বুকে জাফরান রঙের রোদ—এই ছিল তার জগৎ।" সে বালবিধবা, কিন্তু সুন্দরী। এবং তদুপরি, যৌবনের ভয়ঙ্কর আগুনের হাত থেকে "কাজলরূপী ঘৃত-কলসকে রক্ষা করার জন্য তার উপর বিধিনিষেধের অন্ত ছিল না।"···অস্বস্তির এইসব ক্রমবর্ধমান চাপ সহ্য করতে না পেরে, একটু হাল্কা পায়ে চলতে না পেরে—কাজলকে লুকিয়ে এসে দাঁড়াতে হতো ফুল্লশ্রীর ঘাটে, যেখানে "তার বুকের ছোট ছোট আকাঙ্ক্ষার মতন" ঢেউগুলো উঠেই আবার ভেঙে পড়ত। তাই দেখত কাজল এবং আরো কিরকম যেন একটা অসুস্থ হাহাকার বোধ করত। সুতরাং কোনো একদিন, কোনো এক পাঁচুদার সঙ্গে সে পালিয়ে এলো কলকাতায়।

কিন্তু যে-পল্লীতে তারা এসে উঠল, সেখানে "সন্ধ্যার পর ঘরে নাচ গান শুরু হয়। তবলা বাজে, সঙ্গে চলে হৈ হুল্লোড়।" কাজল সহজেই সব বুঝতে পারল। বিদ্যাসাগরী মতে বিয়ে করবার স্বপ্ন দেখিয়ে পাঁচু তাকে এখানে যেমন অনায়াসেই এনেছিল, তেমনই হঠাৎ, কিছু না বলে একদিন এইখানেই তাকে, এই হিংস্র কঠিন আবহাওয়ায় ফেলে রেখে চলেও গেল, বা বলা যায়, আর ফিরল না তার ভাড়া-বাকি-পড়া ঘরে। তারপর বাড়ির গ্রামের সেই অপরূপ রৌদ্রছায়ায় ফিরতে না পেরে, কাজল আস্তে-আস্তে মিশে যায় পিরমিল (অর্থাৎ, প্রমীলা) বাড়িউলির অন্য সব পুরনো বাসিন্দা সুবালা, প্রিয় ও রসবতীদের দলে। প্রথম প্রথম, তবু যেন ঠিক ও-রকম হতে পারে না, অনেকটা অভিজাত আত্মবোধের কারণে, বাকিটুকু সহজাত ঘৃণায় লজ্জায়। ইতিমধ্যে ভদ্ররাস্তায় নির্মল চলাফেরার চেষ্টায় ঠোক্কর খায়। টের পায় মেয়ে-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পুরাণসিন্ধু-র বাঁকা ইঙ্গিত। ফিরে আসতে হয়

এই অন্ধকারেরই দিকে। তার মনে হয় "পৃথিবীটা যেন পাঁচু আর পুরাণসিন্ধুতে ভরা।"

অবশেষে, তারপর, কাজলের ঘরে প্রথম 'বাবু' আসে। তবু ঠিক যেন 'বাবু' নয়। নাম, রথীন। শিক্ষিত ধনী যুবক—কাব্যভক্ত এবং ভদ্র, বুদ্ধিমান। স্বভাবতই, কাজলকে সে ভালোবেসেই চায়। কাজল এই গণিকাপল্লীতে থাকুক, এটা তার পছন্দ নয়। সুতরাং অন্য এক পরিষ্কার (?) পরিবেশে কাজলকে নিয়ে যায়। কিন্তু ঘটনার চাকাও ঘুরতে থাকে, যেমন ঘোরে। কাজল একটি ফুটফুটে কন্যাসন্তান প্রসব করে। শুধুমাত্র বিবাহটাই হয় না রথীনের সঙ্গে। কেন না, দুর্ভাগ্যক্রমে রথীন মারা গেছে ততদিনে। রথীন যে কাজলকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, এটা সত্য। কিন্তু 'ঘটনাচক্র' নামে অলক্ষ্য অথচ স্বাভাবিক বস্তুটি সত্যের উপর টেক্কার চালের খেলা দেখাবার ক্ষমতা রাখে; এবং সে 'ঘটনাচক্র' যদি স্থায়ী ধনতান্ত্রিক স্বার্থের অলৌকিক হাতের দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে ক্রমেই সহজতর হয়ে ওঠে হাজার-হাজার কাজলের অধঃপতন, ঐভাবে। ঘরে নতুন নতুন 'বাবু'র অনায়াস আগমন যতটা সম্ভব হয় এদের ক্ষেত্রে, ঠিক ততটাই অকল্পনীয় হয়ে উঠতে থাকে অন্য কোনো সুস্থ রথীনের সংসারে কাজলদের উদ্ধার। সুতরাং কাজলের কাছে রথীনের মতো আর কেউ এলো না। এলো স্খলিত, চরিত্রহীন, মদ্যপ প্রবৃত্তির স্বর্ণমৃগ। এবং আশ্চর্য, এই আবহাওয়ার মধ্যেও অপ্রত্যাশিত পদশব্দে হঠাৎ-ই এলো আরো দু-জন। তারা—সাধন ও হারীত। সাধনের যাওয়া-আসা উপন্যাসের অনেকটা জুড়ে। রথীনের বন্ধু সাধন। প্রাণে মনে কবি। সাধনের শ্রদ্ধা ও স্নেহ অহরহ কাজলকে স্নিগ্ধ করে রাখে। রথীনের অনুপস্থিতি, রথীনের মৃত্যু এবং এই উল্লোল গণিকাবৃত্তির চাবুকের দাগ ইত্যাদিকে ভুলিয়ে রাখে সাধনের অবাধ সরল আত্মীয়সুলভ ব্যবহার। সাধন কাজলের কাছে বন্ধুত্বের মমতাময় অধিকারে আসে। এবং আংশিকভাবে ভরাট করে রাখে তার পণ্য শরীর-মনের বিপুল ক্ষুধার্ত শূন্যতাকে। আর হারীত একজন পলাতক রাজনৈতিক কর্মী, যার পিছনে পুলিশ, সামনে অনিশ্চয়তার শঙ্কিত রক্তাক্ত রাস্তা। সাধনের বন্ধু। যার হাঁটুতে পুলিশের বুলেটের দগদগে ঘা। এবং যে কাজলের ঘরে কিছুসময় লুকিয়ে থাকতে এসে এক অন্য পৃথিবীর কথা নিঃশব্দে

তার অস্তিত্বে সঞ্চারিত করে দিয়ে যায়। যার ফলে, কাজল তার প্রতি মনে মনে ভীতি পোষণ করলেও, কী-এক অপরূপ সমবেদনায় হারীতের দারুণ ক্ষতটির নিরাময় করার জন্য ব্যতিব্যস্ত, ব্যাকুল হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, এরা দু-জন কাজলের শরীরের প্রতি কোনো সম্পর্কিত ক্ষুধা পোষণ করে নি, যদিচ কাজলের উপস্থিতি এদের চোখে একটি সুন্দর কোমল বিস্ময়মাত্র ছিল।

উপন্যাসটিতে অনেক মানুষ অমানুষের ওঠা-বসা বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও উপরোক্ত হারীত ও সাধনই যে সর্বাধিক গভীর গম্ভীর ছাপ রেখে যায়, এটাই এ-রচনার মাননির্ণয় করতে পেরেছে। রমেশবাবু কোথাও কোনো সামান্যতম সার্মন (যা প্রচার করার অসংখ্য সুযোগ এখানেও ছিল) দেন নি, শুধু সাদামাটা প্রতিটি চরিত্রের (পিরমিল বাড়িউলি, সুবালা, প্রিয়, আলতার মা, পুরাণসিন্ধু, হোমিওপ্যাথ ডাক্তার প্রভৃতি অনেকেই) মাধ্যমে জীবন্ত করে তুলেছেন সাধারণ মানুষের অদেখা এক বিষণ্ণ, আহত জগৎ।

এই চরিত্রগুলির নির্বাচন যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনই অব্যর্থ। প্রেভোস্ত-এর 'মার্নো', ডীফো-র 'মোল্ ফ্লাণ্ডার্স্', কুপরিন-এর 'য়্যামা' বা ইশারউড্-এর 'স্যালি বোয়েলস্'-এর সঙ্গে এদিক-সেদিকের নিকট-দূর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া গেলেও—কাজল ভারতীয় এবং মূলত বাঙালী, বলতে পারি। আর যেহেতু বাঙালী ও বাঙলা ভাষায় রচিত এই 'বিষয়ের' প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস, সেই কারণেই হয়তো গল্পবস্তুর কাঠামো শক্ত থাকলেও, লেখক উপযুক্ত রকমের চরিত্রবিশ্লেষণে বা বিশদবর্ণনায় ততটা সোচ্চার নন (শেষ অংশে কাজলের চেতনাবিভ্রমের রিয়ালিটি স্বীকার করে নিয়েও বলছি)। কেননা, ভারতীয় মুড-এর ভাবপ্রবণ কোমলতা সেজন্য দায়ী। ভণ্ডুল এবং রথীনই তার উদাহরণ। প্রয়োজনবোধে ভণ্ডুল যত সহজে ইতর, উদাস ও চতুর হতে পেরেছে, রথীন আপনি পবিত্র (!) থেকেও ততটা অনায়াসে ঋজু, উজ্জ্বল ও নির্ভয় হতে পারে নি। এবং কাজলকে বিবাহ করার কঠিন সিদ্ধান্তে পৌছবার মুহূর্তেই তার মৃত্যু ঘটল। তদুপরি, যে ধনতান্ত্রিক চক্র কাজলকে ঐ বিপর্যয়ে টেনে নামিয়েছে, সে-প্রসঙ্গেও বড় একটা তাকে কথা বলতে শুনি নি। কাজল এক অপরূপ জীবন্ত রমণী হিসেবেই কী তার 'হার হাইনেস'

ছিল? অথবা, কাজলকে উদ্ধার করার নেশাটুকুই রথীন উপভোগ করতে চাইত?…রথীন কী কুপরিন-এর 'লিখোনিন' মাত্র, আর কাজল 'লিউব্কা'? —প্রশ্নগুলি করে রাখলাম অতি ছোট দু-একটি অসম্পূর্ণতার যথাযথ মীমাংসার আকাঙ্ক্ষায়। নচেৎ এটুকু বুঝতে পারি, 'মোল্ ফ্লাণ্ডার্স্'-জাতীয় বিদেশী লেখার rawness কিংবা সুস্পষ্ট ও চিত্রবৎ vividity ভারতীয় পাঠকের মেজাজে অনুধাবন করা এখনো অকল্পনীয়। সুতরাং তা লিখে ছাপানো হয়তো আরো দুষ্কর।

আশা করব, 'কাজল' অন্তত বহুপঠিত হোক; এবং মনে হয়, উপন্যাসটির ভাষান্তরে সেটি আরো বেশি করে সম্ভব।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

নরক। উমানাথ ভট্টাচার্য। কথকতা। তিন টাকা পঁচাত্তর ন. প.।

'নীচের মহল', 'ঘূর্ণী', 'জল' ও 'শেষ সংবাদ' নাটকের রচয়িতা, মঞ্চ ও চিত্রাভিনেতা উমানাথ ভট্টাচার্যের স্বপ্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'নরক'।

নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই সাবলীলতা। প্রতিটি উপন্যাসে এ-ধরনের কোনো বৈশিষ্ট্য খুঁজে বার করা কঠিন। এবং সহজ ও সাবলীল না হলে নাটকের বলিষ্ঠতার হানি ঘটে, উপন্যাসে তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

উমানাথ ভট্টাচার্য নাট্যকার বলেই হয়তো এঁর উপন্যাসটির গতি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। লেখকের বক্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। লেখার ভঙ্গিতে অনেক সময়েই এ বক্তব্য সুন্দরভাবে সরল, কখনো বা হয়তো অতিরিক্ত।

সারল্যের স্বাভাবিক পর্যায়ে অনেক ক্ষেত্রে বক্তব্য গ্রাহ্য মনে হয় না। সেজন্য হয়তো অনেক সময় দুর্বোধ্যতার আরোপ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উমানাথবাবুর লেখার ঢঙটিতে শেষোক্ত প্রয়োজন কখনোই হয় নি। তিনি স্বাভাবিক সারল্যের একধাপ নেমে এসে তাঁর বক্তব্যকে পাঠকের বুদ্ধিগ্রাহ্য করে তোলেন, যখন তার সারল্যের জন্যই তাঁকে অস্বীকার করা সম্ভব হয় না। গণনাট্য আন্দোলনে যুক্ত লেখকের পক্ষে এ-ভঙ্গিতে এসে পৌছনো হয়তো স্বাভাবিক।

"খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে গণেশের ধারণা হয়েছিল, এদেশে কেরানীর অপ্রতুলতা নেই; সেই হিসাবে মাস্টারের সংখ্যা অনেক কম।…

খুব স্বাভাবিক। কেরানীগিরির বাজার বসেছিল দেড় শ বছর আগে। নতুন বাজার, নতুন সকাল,—সেদিন ক্রেতার অভাব ছিল না। পাঁচ টাকার সওদা পঁচিশ টাকায় বিকিয়েছে।…

দেড় শ বছর পরে আবার নতুন সকাল হয়েছে, সূর্য উঠেছে নতুন করে। কিন্তু বাজার বসে নি। ক্রেতা নেই; তাই কেরানীবাজারে ঝাঁট পড়ে না। পচা শাক-তরকারী আর মাছের আঁশ থকথক করছে; পা রাখার জায়গা কম। কেরানীর দল মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়।…"

এই জগৎটি লেখক সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। গণেশের অনেক আশার প্রথম চাকরি। তারপর হঠাৎ বিশ টাকার নোট আসে থামে। কর্তারা দিয়েথুয়ে খান। কৃপাদৃষ্টি করেন।

গণেশ মফঃস্বলে স্কুল মাস্টারি নেয়। এইসব স্কুলের দলাদলির জগৎ পরিষ্কার ও পাঠকের পরিচিত লাগে। কিন্তু সুকুমার ও তার বার-রেস্তোরাঁর জগৎ, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান জগৎ, এমনকি পিম্প কথাটি পর্যন্ত লেখকের অজ্ঞাত বলে মনে হয়। তার কোনো ছবি উপন্যাসে স্পষ্ট ফোটেনি। এ অংশগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় বলেই হয়তো ত্রুটিটা মারাত্মক হয়নি।

উপন্যাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংশ হরগোবিন্দবাবু-উপাখ্যান। বৃদ্ধ, চোখে ছানি। গণেশ ও তার সহকর্মী তাঁর বাধ্যতামূলক রিটায়ারের পরদিন অন্ধকার গলিতে গিয়ে দাঁড়ান।

"কয়েক হাত দূরে পুরনো পাকা বাড়িটার সামনে কিছু লোক ভীড় করে আছে। অনেকের হাতেই হ্যারিকেন লণ্ঠন। গণেশ দেখল, সদরে মস্ত দরজা, কিন্তু একটাও কপাট নেই। গুহার অন্ধকার মুখের মতো।

কিন্তু এরা এখানে দাঁড়িয়ে কেন! কোন বিপদ ঘটেছে কি?

…কেন আপনারা খবর পান নি? হরগোবিন্দবাবু—"

উমানাথ ভট্টাচার্যের প্রথম উপন্যাসেই শতত্রুটি সত্ত্বেও তাঁর সহজভঙ্গি জিতেছে। আশা করি আবার তিনি নরক ঘাঁটবেন—আরও বৃহত্তর সংহত নতুন উপন্যাসে।

জিষ্ণু দে

ক্রৌঞ্চ-নিষাদ। অজিত দাশ। এম. সি. সরকার (প্রাঃ) লিঃ। ছ-টাকা।
মানুষের ছবি। সমীর মুখোপাধ্যায়। নিউ যুগের বাণী। তিন টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।
দিনের পর দিন। রামগোপাল নাথ। আনন্দ পাবলিশার্স। দু-টাকা।

একখানি কাব্যগ্রন্থ ও একখানি উপন্যাস ইতিপূর্বে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও 'ক্রৌঞ্চ-নিষাদ'-এর লেখক শ্রীযুক্ত অজিত দাশকে যদি 'তরুণতম' বিশেষণে চিহ্নিত করি, তাহলে তিনি কি আহত হবেন? স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হচ্ছি, উপরোক্ত বই দু-খানির নাম আলোচ্য উপন্যাসটির নামপত্র মারফৎ জানতে পারলুম। সুতরাং তাদের গুণাগুণ বলতে পারব না; 'ক্রৌঞ্চ-নিষাদ' পড়েছি, পড়া শেষ করার পর, মনে মনে ভেবেছি: লেখক যথার্থই 'তরুণতম'। দীর্ঘ তিনশ কুড়ি পৃষ্ঠার এই উপন্যাসটির প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠাতেই শিথিল বাক্যবিন্যাস, অতর্কিত বাগ্মিতা, চরিত্রাঙ্কনের অর্ধস্ফুট আঁচড় স্পষ্টতই তরুণতম লেখকের চারিত্র্যকে প্রকট করে। এগুলি প্রত্যেকটি গুরুতর অভিযোগ সন্দেহ নেই; কিন্তু যখন দেখি, বইখানি দীর্ঘ হলেও সঙ্গত সময়ের চেয়ে অনেক বেশি লেগেছে শেষ করতে, যখন নায়ক সুকুমার থেকে আরম্ভ করে গাঁয়ের ডাক্তার সবাই একটু সুযোগ পেলেই দেশ-কাল-সমাজ নিয়ে বাচালতা করছে, যখন দেখি একটি কমিউনিস্ট চরিত্র বলছে, "এখনও সময় আছে। আমাদের দলে যোগ দিন। এখানে শাখা খুলুন"…ইত্যাদি ইত্যাদি, তখন আমি নাচার। কিন্তু এমনিতর বিচ্যুতির পাশাপাশিই লেখকের সম্ভাবনাসূচক কিছু কিছু ব্যাপার আমার দৃষ্টি এড়ায় নি। প্রথমত, বিকারগ্রস্ত মননবিলাসের প্রকোপ থেকে সরে এসে শ্রীযুক্ত দাশ সহজ কাহিনীকে বিবৃত করেছেন সহজভাবে। সাহিত্যজীবনের প্রাথমিক পর্বে কাহিনী তথা চরিত্রচিত্রণে হাত পাকিয়ে তোলাই যুক্তিযুক্ত, ব্যক্তিগতভাবে আমার এই মত। দ্বিতীয়ত, অজস্র চরিত্রের আনাগোনার মধ্যে লেখক মূল কাহিনীসূত্রটি হারিয়ে ফেলেন নি। সরকারী পুনর্বাসনের কাজে নিযুক্ত সুকুমার তার কর্তব্যের প্রতিটি পর্বেই যে ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত যার জন্যে পরাজিত হওয়া ছাড়া নান্যপন্থা—এই ব্যাপারটি শ্রীযুক্ত দাশ চমৎকার দক্ষতায় উপন্যাসের মধ্যে রাখতে পেরেছেন। সরকারী উদ্বাস্তনীতি সম্বন্ধে অবশ্য আমাদের ধারণা ১৯৪৭ সাল থেকেই তৈরি; ইদানীং এই ধারণা বাংলাদেশের কিছু কথাকারের উপজীব্য বিষয় হয়েছে। অবশ্য এর অনেকগুলোই আধাবাস্তব কল্পনাবিলাস, অগভীর, কখনো বা

ভাবোদ্বেলতার অশ্রুতেই স্যাঁতসেতে। কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধ এই বিশেষ সমস্যাটিকে শ্রীযুক্ত দাশ যেভাবে তাঁর উপন্যাসে বিধৃত করেছেন তা তন্নিষ্ঠ সমীক্ষারই দৃষ্টান্ত। এবং সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি কেবলমাত্র এই কারণেই উপেক্ষা করা যেতে পারে। তবে নায়কচরিত্রটি কয়েকবার চোখের জল ফেলেছে, লেখক কি এর মধ্য দিয়ে আমাদের বুঝতে দিয়েছেন যে সুকুমার রোম্যান্টিক, আবেগপ্রবণ এবং কোমলমতি যুবক ? আর মহিলাদের যতখানি সুলভ দেখা গেল, বাস্তবে তা কি সত্য ? সুকুমার যেখানে যেখানে গিয়েছে, সেখানেই হয় খুকু, নয় জ্যোৎস্নাময়ী, নইলে শুভ্রা তার সঙ্গে কথনো আলাপিত, কথনো প্রণয়াসক্ত হয়েছে কিম্বা আকৃষ্ট। হয়তো কুড়ি ফর্মার দীর্ঘ বইটি এর ফলে কিঞ্চিৎ রসালো আকর্ষণীয়তা পেয়ে থাকবে। যতদূর মনে হয় শ্রীযুক্ত দাশের অভিপ্রায় এইরকম কিছু নয়। বাজারচালু লেখকদের বস্তাপচা কৌশল শেষপর্যন্ত এক নবীন সাহিত্যিককে প্রভাবিত করবে, ভাবতে ইচ্ছা করি না। মলাটটি কিন্তু ভালো লাগলো না, যদিও তা ও. সি. গাঙ্গুলীর হাতের আঁকা। বলাবাহুল্য ; 'প্রকাশকের নিবেদন'-এর বর্ণচোরা বিজ্ঞাপনটি সুরুচির পরিপন্থী।

এখানেও প্রকাশকের নিবেদন। শ্রীযুক্ত সমীর মুখোপাধ্যায়ের 'মানুষের ছবি' উপন্যাসের গোড়াতেই প্রকাশক জানিয়েছেন,…"অস্তিত্বের যন্ত্রণায় অস্থির উপন্যাসটি আজ থেকে সাতবছর আগে অধুনাবিলুপ্ত একটি সাহিত্যপত্রে একদা যে যাত্রা সুরু করেছিল, লেখকের অনিচ্ছায় মাত্র দু-ফর্মা ছাপার পর তার চালভঙ্গ হয়।…আজ যখন নতুন করে আত্মপ্রকাশের আয়োজন হলো তখন দেখা গেল বাংলাসাহিত্যকে আগের চেয়ে অনেক তীব্রভাবে আন্তর্জাতিক সাহিত্যের ঘূর্ণিমণ্ডল স্পর্শ করেছে। লেখক এ সম্বন্ধে সজাগ ও অবহিত থেকেও এই উপন্যাসের রূপান্তর কামনা করেন নি।" উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ ; কিন্তু গ্রন্থখানির আলোচনায় অনেকখানি সময় আমার লাঘব হয়ে গেছে প্রধানত এই উদ্ধৃতির সহায়তায়। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রকাশককে উল্টে ধন্যবাদই দিতে হয়। আমার যেটুকু বলবার আছে তা সামান্যই। বইখানির গোড়া থেকে শেষপর্যন্ত একটা অগোছালো, ছাড়াছাড়া গল্প ছাড়া কিছু পাই নি। শূয়োর, সুবোধ, গাঁজাখোর সন্ন্যাসী, রাধা ("একটুও লজ্জা নেই রাধার"), মিয়াজান গাড়োয়ানের ঘোড়ার গাড়ি, ইত্যাদি

হাজারএক চরিত্র আর ঝাঁঝালো যৌন-আবেদন 'মানুষের ছবি'কে রীতিমতো জাঁকালো করে তুলেছে। কিন্তু পড়ার ধৈর্য প্রায়ই আমায় হারাতে হয়েছে— কাহিনীগত শিথিলতার জন্য। বইটির প্রথম পাতার প্রথম লাইনেই বানান ভুল এবং ছাপার ভুল (নাকি ভাষার ?) চোখে পড়ল। "গঙ্গার ধারের নরম জ্যোৎস্নায় যখন নিবিড় হাওয়া বয়েছিল সেই মুগ্ধরাতে শুয়োরটিতে এসেছিল চুপিচুপি।" মানে কি ? "নিবিড় হাওয়া", "শুয়োরটিতে"—এই জাতীয় শব্দ সমস্ত বইখানিতে ছড়ানো।

নামের দিক থেকে শ্রীযুক্ত রামগোপাল নাথও পূর্বোক্ত দুজনের মতোই আমার কাছে অশ্রুতপূর্ব। কিন্তু এঁর লেখার হাত যথেষ্ট তৈরি। "অভিভাবকের শাসন এড়িয়ে ভর দুপুরে যেন বাড়ি-পালানো বাচ্চা মেঘ-মেয়েরা বাতাসে শাদা ফ্রক উড়িয়ে এক পা দু পা করে আকাশের মাঠ পার হয়ে উধাও।"— এইরকম সপ্রতিভ উপমা এবং ভাষার সাহায্যে লেখক আমার মনোযোগকে বন্দী করতে পেরেছেন শেষপর্যন্ত। স্মৃতিসর্বস্ব বড়মিস্ত্রী বিনোদবিহারীর সুখ-দুঃখকে কেন্দ্র করে পরিমিত পরিসরের মধ্যে যে-গল্প তিনি লিখেছেন তা উপভোগ্য এবং কোনো কোনো অংশে মর্মস্পর্শী। বিলাসীর দিকে বিনোদের দ্বিধাজটিল দুর্বলতা অবশ্য অতিনাটকীয় পরিণতি পেয়েছে ; আবেগের চড়াসুরে বইটির শেষাংশ বাঁধা ; তবু অস্বীকার করা যায় না লেখকের মানুষ আঁকবার ক্ষমতাকে। তাই 'দিনের পর দিন' উপন্যাসখানি (বরং বলি, বড়গল্প) পড়ার পর স্বভাবতই শ্রীযুক্ত রামগোপাল নাথের পরবর্তী গ্রন্থ পড়বার ইচ্ছা রাখি।

একটি মুখ : তিনটি মন। বাসুদেব সাহা। আলফা-বিটা। তিন টাকা পঞ্চাশ ন. প.।
গাঁয়ের নাম কেয়াপুর। দীপককান্তি দে। আলফা-বিটা। তিন টাকা।
হাঁটি হাঁটি পা পা। সুভাষ চক্রবর্তী। ন্যাশনাল পাবলিশার্স। দু-টাকা পঞ্চাশ ন. প.।

নতুন লেখক হিসেবেও ভাষায় ও বিষয়বস্তুর অবতারণায় কিছুটা পরিণত ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া দরকার। ভাষায় ঋজুতা অবশ্যই সহজসাধ্য নয়, কিন্তু সহজ স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলে চলবেই না। বিষয়গত অভিনবত্ব নিশ্চয়ই পাকা কলমের কাজ, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে চরিত্রগুলি এবং কাহিনীকে—তা সে যেমনই হোক—যথাযথভাবে বিন্যস্ত করার দায়িত্ব

তরুণতম লেখককে পালন করতেই হয়। তাঁর 'একটি মুখ: তিনটি মন' নামক ৮৯ পৃষ্ঠার বড়গল্পটিতে শ্রীযুক্ত বাসুদেব সাহা যথাসাধ্য সেই স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান এবং দায়িত্বপালনের চেষ্টা করেছেন। কাহিনী অতিশ্রুত প্রণয়কেন্দ্রিক; কাজল আর রাধার অন্তর্দ্বন্দ্বও প্রথাসিদ্ধভাবে রূপায়িত হয়েছে। বলাবাহুল্য, এই ধরণের কাহিনীতে কথাবস্তুর আকর্ষণীয়তা তৈরি করাই হচ্ছে জরুরি; চরিত্রগুলির ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্যের সূক্ষ্ম প্রতিচিত্রণের কোনো অবকাশই এতে থাকে না। শ্রীযুক্ত সাহা সঙ্গতকারণেই গল্পতৈরির দিকেই মনোযোগ দিয়েছেন এবং তাতে ভালো বই খারাপ হয় নি। প্রথম কয়েকটি পাতার ভাষা ও অকারণ প্রতি বাক্যের জন্য এক একটি পংক্তি খরচ করার প্রবণতা জনৈক বাঙালী বাজারচালু গোয়েন্দাকাহিনী লেখকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য পরে লেখক এই ব্যাধিমুক্ত হয়েছেন দেখে আশ্বস্ত হই।

শ্রীযুক্ত দীপককান্তি দে-র 'গাঁয়ের নাম কেয়াপুর' আরেকটি পরিচিত বিষয়ের উপর সহজ ভঙ্গিতে লেখা বড়গল্প। অনাথ রায় ও হারাধন মজুমদার নামক গ্রামের দুজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির জঘন্য বিভেদমূলক ও খ্যাতিলোলুপ মানসিকতার উদ্‌ঘাটনই এই গল্পটির উপজীব্য। তবে শ্রীযুক্ত দে-র হাত অপেক্ষাকৃত পরিণত; এবং এই গুণেই কাহিনী সামান্য হয়েও সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। উভয় গ্রন্থেরই প্রকাশন পরিকল্পনা ব্যয়বহুল হলেও উন্নত শিল্পরুচির পরিচায়ক নয়।

গভীর বেদনার বিষয়, তৃতীয় গ্রন্থটির লেখক শ্রীযুক্ত সুভাষ চক্রবর্তী এখন লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁর 'হাঁটি হাঁটি পা পা' উপন্যাসটিতে দোষত্রুটি হয়তো অনুপেক্ষনীয় নয়, কিন্তু বহু জায়গায় প্রশংসনীয় পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছি যা সময়কালে প্রযত্নের নিষ্ঠায় কেলাসিত হতে পারত। মৃত্যু সেই ভবিষ্যৎ-কে অঙ্কুরেই নষ্ট করে গেছে, উপন্যাসটি শেষ করার পর এই খেদ থেকে গেল।

শিবশম্ভু পাল

শিকারীর রোজনামচা ॥ ইভান তুর্গেনেভ। বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো। পরিবেশক: ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ। দু-টাকা একাশি ন. প. ॥

এই গ্রন্থে সঙ্কলিত নক্‌শাগুলি রুশসাহিত্যের সম্পদ বিশেষ। এই গ্রন্থের অনেকগুলি চরিত্র ও ঘটনা প্রাক্‌বিপ্লব রুশদেশের দর্পণ। তুর্গেনেভের অসামান্য কবিত্ব ও গভীর পর্যবেক্ষণ বিষয় ও রচনারীতিকে রূপদী মহিমা দিয়েছে। পরবর্তীকালে গর্কীর হাতে রিপোর্টাজ রচনা যে ঐতিহাসিক শিল্পচরিত্র অর্জন করেছিল, এই গ্রন্থের কোনো কোনো লেখায় তার পূর্বসূত্র আবিষ্কার করা যায়।

অনুবাদের মান সর্বত্র সমান না হলেও এই গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছে।

পারীর পতন: একত্রে তিন খণ্ড ॥ ইলিয়া এরেনবুর্গ। অনুবাদক: অমল দাশগুপ্ত, রবীন্দ্র মজুমদার, অনিলকুমার সিংহ। আট টাকা। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ ॥

বিশ্ববিখ্যাত এই উপন্যাসটি বাংলাদেশে নতুন পরিচিতির অপেক্ষা রাখে না। বহু পূর্বে বর্তমান অনুবাদকত্রয়ের অনুবাদে তিনখণ্ডে প্রকাশিত 'পারীর পতন' এদেশের সাধারণ পাঠকের সামনে উপন্যাসের এক অভিনব জগৎ উন্মোচিত করেছিল। সম্প্রতি ন্যাশনাল বুক এজেন্সী বইটির একত্র ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করলেন।

রুশ উপন্যাস ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঐতিহ্যে পুষ্ট এরেনবুর্গ বর্তমান-কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক এবং 'পারীর পতন' নিঃসন্দেহে বিশ্বসাহিত্যের এক সম্পদ। আমরা বিশ্বাস করি শুধু পাঠক নয়, বর্তমান লেখক সমাজেরও এই উপন্যাস পুনরায় অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করার প্রয়োজন আছে।

নবম তরঙ্গ। ইলিয়া এরেনবুর্গ। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ। প্রথম খণ্ড, অনুবাদক: সোমনাথ লাহিড়ী। চার টাকা পঞ্চাশ ন. প.। দ্বিতীয় খণ্ড, অনুবাদক: সত্য গুপ্ত। ছ-টাকা ॥

'পারীর পতন'-এর পর 'ঝড়' ও 'নবম তরঙ্গ'। যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ক্রনিক্‌ল্ লিখেছেন এরেনবুর্গ। রুদ্ধশ্বাস কাহিনী ও আপাত সুখপাঠ্যতার অভাব বহু ক্ষেত্রে স্বীকার করে যাঁরা একবার এরেনবুর্গের বিশ্বে প্রবেশ

করবেন, পরিণামে তাঁরা লাভবান হবেন, সন্দেহ নেই। যদিও পরবর্তী দুটি গ্রন্থমালা উপন্যাসরূপে 'পারীর পতন'-এর মহত্ত্ব ও সাফল্য অর্জন করে নি—এ-কথাও সত্য। এরেনবুর্গ চিরদিনই বিশিষ্ট লেখক, বিচিত্র মানুষ। সম্প্রতিকালে আরও একবার তাঁকে ঘিরে বিতর্ক উঠেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'নবম তরঙ্গ' গ্রন্থের প্রকাশনা ও পাঠ অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। আশা করব অচিরে উপন্যাসটির অবশিষ্টাংশের প্রকাশনাও সুসম্পূর্ণ হবে।

স্তেফান জোয়াইগের গল্প-সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড। অনুবাদক : দীপক চৌধুরী। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী। পাঁচ টাকা॥

বাংলা ভাষায় জোয়াইগ বহুল প্রচারিত। তাঁর অনেকগুলি গল্প ও উপন্যাস পত্র-পত্রিকায় বা গ্রন্থাকারে ভাষান্তরিত হয়েছে। তথাপি খণ্ডে খণ্ডে জোয়াইগের এই গল্প সঙ্কলনের প্রকাশ অভিনন্দনযোগ্য। একত্রে লেখাগুলি পাওয়ায় পাঠক মাত্রেই লেখক সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা করতে পারবেন।

দীপক চৌধুরী মৌলিক রচনার থেকে অনুবাদকর্মে যে অধিকতর পারদর্শী—এই গল্প সংগ্রহে তিনি নিজেই তার প্রমাণ দিয়েছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে 'খেলার রাজা দাবা' (The Royal Game), 'পলাতক' (The Runaway), 'অপরিচিতার পত্র' (Letter from an unknown woman), 'চন্দ্রালোকিত কানাগলি' (Moonbeam) ও 'লেপোরেলা' (Leporella)—মোট এই পাঁচটি গল্প সঙ্কলিত হয়েছে। প্রতিটি গল্পেই জোয়াইগের রচনার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি পাই।

জোয়াইগ ইওরোপীয় সাহিত্যের এক বিচিত্র পুরুষ। বহু ভাষায় পারদর্শিতা, বহু দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, বহু মনস্বীর অন্তরঙ্গতা ও বিচিত্র জীবন জোয়াইগের জন্য যে ভূমি প্রস্তুত করেছিল—শেষ পর্যন্ত তিনি তার ওপর মহৎ সৃষ্টির সৌধ নির্মাণ করে যেতে পারেন নি। অথচ কবিতা, নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, জীবনী ও অনুবাদ—তিনি কি না লিখেছেন। বাস্তবিক জীবনী রচনায় ও অনুবাদে জোয়াইগ যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, সেই উচ্চতা তাঁর অনেকানেক মৌলিক সৃষ্টিশীল রচনা অর্জন করতে পারে নি—বহু সমালোচক এমন আক্ষেপ করেছেন। কিন্তু নিঃসন্দেহে তাঁর কটি গল্প সাহিত্যের সম্পদ বিশেষ। প্রথম খণ্ডে সঙ্কলিত 'অদৃশ্য শিল্প' (The

Invisible Collection) ও আলোচ্যখণ্ডের প্রথম দুটি গল্প এই জাতের রচনা। দুটি বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ বয়েসে জোয়াইগকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছিল এবং সেই বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতেই বিপন্ন ব্যক্তি ও মানবতার অসামান্য আলেখ্য এই গল্প তিনটি।

উভয় খণ্ডেই অনুবাদ সম্পর্কে একটি অবান্তর ভূমিকা ও দ্বিতীয় খণ্ডে জোয়াইগের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আছে। অনুবাদ কোথাও কোথাও আড়ষ্ট। তথাপি উপরোক্ত গল্প তিনটির আকর্ষণে ও অন্য গল্পগুলির কারণে পাঠকমাত্রেই জোয়াইগের গল্প সংগ্রহ সংরক্ষণ করতে প্রলুব্ধ হবেন।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

গান বাজনা শেখো॥ বৈদ্যনাথ ঘোষ। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির। একটাকা পঞ্চাশ ন. প.॥

প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী এই নাতিক্ষুদ্র গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন : "গান-বাজনা সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নেই তাদেরই জন্য বইখানি লেখা। কিন্তু এ ধরনের বই লেখা অত্যন্ত কঠিন এজন্য যে,…উচ্চ থেকে নিম্নস্তরে নেমে এসে শিশুদের মনস্তত্ত্বকে জেনে তাদের মতো বই লেখা বড়ই কঠিন। …"গান-বাজনা শেখো" বইখানির ভাষা অত্যন্ত সরল এবং রচনাও তাৎপর্যপূর্ণ ও সার্থক হয়েছে বলে মনে করি। …শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথবাবু নিজে একজন বিচক্ষণ সঙ্গীতশিল্পী এবং সঙ্গীতে শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছেন।…গ্রন্থটি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতগুণীদের সমাজেও সমাদর লাভ করুক এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।"

সাহিত্য-চিত্রকলা-সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়ে এই ধরনের গ্রন্থের প্রয়োজন আমাদের দেশে অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু তুলনায় গুণে বা পরিমাণে রচনা অল্প। আমরা আশা করি লেখক ও প্রকাশক এদিকে অধিকতর মনোযোগ দেবেন এবং পাঠককুল বর্তমান গ্রন্থের সমাদর করে তাঁদের উৎসাহ বর্ধন করবেন।

অনুভব ॥ রাধানাথ সিংহ। 'পুস্তক'। দু-টাকা ॥

মানস প্রতিমা ॥ রাধানাথ সিংহ। 'পুস্তক'। দু-টাকা ॥

দুটি নাতিক্ষুদ্র কবিতা সঙ্কলন। প্রথম গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছেন: "...বর্তমান সাহিত্যের উদ্দেশ্য জনতার জীবনের জয়গান। রাজনীতির উদ্দেশ্য ঠিক তাই। অতএব সাহিত্য ও রাজনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রামায়ণ, মহাভারত একাধারে কাব্য, রাজনীতি ও সমরনীতি। বর্তমান ভারতীয় সাহিত্যে অভাব আছে তার।"

দ্বিতীয় গ্রন্থের ভূমিকা: "কবিতা...লিখি, আনন্দ ও বেদনার তীব্র অনুভূতিতে।"

সুতরাং দুটি গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে দুই মনোভাবের কবিতা আছে যদিও তা একই কবির একই রচনাভঙ্গির সাক্ষ্যবহ। দুটি গ্রন্থেই কবি আন্তরিক।

অথ নট ঘটিত ॥ সূত্রধার। বসুধারা প্রকাশনী। তিন টাকা পঞ্চাশ ন. প. ॥

'সূত্রধার' নামের অন্তরালে যে মনস্বী নিজেকে গোপন রেখেছিলেন, নিকট অতীতে তাঁর জীবনাবসান হয়েছে।

ঠিক ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে না হলেও খানিকটা বৈঠকী ঢঙে লেখা এই সুখপাঠ্য গ্রন্থ বাংলা নাট্যজগতের ইতিহাস সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি করে। কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য চিত্র এই গ্রন্থের অন্য আকর্ষণ।

ভারতের চিত্রকলা ॥ অশোক মিত্র। পরিবেশক: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। পনেরো টাকা ॥

চিত্রকলা বিষয়ে খ্যাতনামা আলোচক শ্রীঅশোক মিত্র রচিত এই বৃহদায়তন গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সংযোজন। অনেকগুলি চিত্র গ্রন্থটির অতিরিক্ত সম্পদ।

বাংলার বেকার সমস্যা ও তার প্রতিকার ॥ যামিনীরঞ্জন দাস। শ্রীপ্রকাশনী। একটাকা পঞ্চাশ ন. প. ॥

নাতিক্ষুদ্র আলোচনাগ্রন্থ।

চা মাটি মানুষ (২য় খণ্ড) ॥ বীরেশ্বর বসু। কথামালা প্রকাশনী। পাঁচ টাকা পঞ্চাশ ন. প. ॥

চা-বাগান ও চা-শ্রমিকদের জীবনভিত্তিক উপন্যাসের মধ্যপর্ব।

গোড়ার কবিতা ॥ সুভাষ সরকার। মিত্রালয়। পাঁচ টাকা পঞ্চাশ ন. প. ॥

লেখকের প্রথম উপন্যাস।

নীল সমুদ্র ॥ শিশিরকুমার দাশ। দেবদত্ত এণ্ড কোম্পানী। চার টাকা ॥

কবি ও প্রাবন্ধিক শিশিরকুমার দাসের প্রথম উপন্যাস পাঠক মাত্রকেই কৌতূহলী করবে।

দুই সমতল ॥ কার্তিক ভট্টাচার্য। ন্যাশনাল পাবলিশার্স। দু-টাকা ॥

লেখকের এই প্রথম উপন্যাসই তাঁর ভবিষ্যৎ রচনা সম্পর্কে পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টিতে সমর্থক।

দুই ঋতু ॥ আতাউর রহমান। এক টাকা পঞ্চাশ ন. প. ॥

পূর্বপাকিস্তান থেকে প্রকাশিত তরুণ কবির কাব্যসঙ্কলন। বেশ কয়েকটি রচনায় কবিমনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ বর্তমান।

মহাবোধ ॥ মনীষা দেবী চট্টোপাধ্যায়। অর্চনা পাবলিশার্স। পঞ্চাশ ন. প. ॥

ক্ষুদ্র পদ্য সংকলন।

তাও-তে-চিং ॥ লাওৎ সে। অনুবাদক: অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাহিত্য অকাদেমী দু-টাকা ॥

সু-অনূদিত সুভাষিতাবলী।

কজ্জল সেন

সংস্কৃতি সংবাদ

বিয়োগপঞ্জী

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে।

আমাদের এই অনাহার ও অকালমৃত্যুর দেশে আশি বছর আয়ু কম নয়! কিন্তু বিধানচন্দ্রের ক্ষেত্রে এ-মৃত্যু সর্বতোভাবে আকস্মিক। কারণ আমৃত্যু তিনি ছিলেন উদ্যমী পুরুষ। জন্মদিনের উৎসবে বন্ধুজন যখন তাঁর শতায়ু কামনায় নিশ্চিত ছিলেন, তখনই কাল তাঁকে হরণ করল। হয়তো তাই এই মৃত্যুর বেদনা দেশবাসীর মনে এমন বেজেছে! চিকিৎসক হিসেবে তাঁর প্রবাদে পরিণত পারদর্শিতা, জাতীয় আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ও ১৯৪৮ সাল থেকে দেশশাসন—এ-সমস্তের স্মরণ ও বিশ্লেষণ এখানে বাহুল্য মাত্র। বিধানচন্দ্রের আকস্মিক প্রয়াণে শাসনব্যবস্থা ও শাসকদলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হলো, হয়তো তা সংকটেরই নামান্তর।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্লামিক ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর মাখনলাল রায়চৌধুরীর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে। দীর্ঘদিন তিনি ইতিহাসের এই বিশেষ শাখাটির চর্চা ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন।

আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রখ্যাত নট ছবি বিশ্বাসের অকালপ্রয়াণ ঘটেছে। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক চলচ্চিত্রাভিনেতৃসমাজের প্রবলতম ব্যক্তিত্ব। ছবি বিশ্বাসের শিল্পী জীবনও সর্বতোভাবে এই ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ। আমাদের মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এই গুণীর অবদান বড় সামান্য নয়!

মৃত্যুর স্পর্শের বাইরে জীবনের যে স্মৃতি, আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে তা স্মরণ করি।

ইতিহাসের অভিপ্রায়

আলজিরীয়ার মুক্তিসংগ্রাম জয়যুক্ত হয়েছে। দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ সময়ব্যাপী আন্দোলন ও অপরিসীম মূল্যের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা।

আমরা অভিনন্দন জানাই আলজিরীয়ার সেই অনমনীয় মানুষদের, যাঁরা ইতিহাসের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আমরা অভিনন্দন জানাই সেই স্বল্প শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ফরাসীদের, যাঁরা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ-বিরোধী আন্দোলনে অতন্দ্র থেকে ইতিহাসের আরও এক অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ফ্রান্সের ঔপনিবেশিকশক্তির আকাশচুম্বী স্পর্ধা অবনমিত করেছে এই যুগ্ম শক্তি। আমরা স্মরণ করি তাঁদের—মুক্তির আদর্শে আজ যাঁরা শহীদ। শ্রদ্ধা জানাই তাঁদের, যাঁরা লাঞ্ছিত হয়েছেন। আমরা ভরসা রাখি উৎসব সমারোহে আলজিরীয়বাসী কঙ্গোর শিক্ষা বিস্মৃত হবেন না।

ঔপনিবেশিকতার ধারাবাহিক পরাভব ও স্বাধীনতার ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ বিশ্বমানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ মস্কোর দিকে। পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তির আহ্বানে এখন সেখানে বসেছে সর্বদেশ ও সমাজের প্রতিনিধি-সম্মেলন।

পৃথিবীর ইতিহাসে এতবড় সংকট আর আসে নি। সমরসজ্জা, পরীক্ষা-মূলক বিস্ফোরণ ও যুদ্ধচক্রান্তের আয়োজন মানবসভ্যতাকে সর্বব্যাপী বিনাশের দ্বারপ্রান্তে এনেছে। অথচ এই সভ্যতাই গ্রহে গ্রহান্তরে মানুষের উপনিবেশ গড়ার স্পর্ধা রাখে।

পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্রের পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ ও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের যে দাবি সোভিয়েত দেশ ও সমাজতান্ত্রিক জগৎ দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে করে আসছেন—ধনতান্ত্রিক প্রচার কৌশলে তার আন্তরিকতা সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও সন্দিগ্ধ ছিলেন। আজও সে সন্দেহ সর্বাংশে ঘোচে নি। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে শান্তির আদর্শ যে প্রভূত জনপ্রিয় হয়েছে, শান্তির সংগ্রাম যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে দেশে দেশে—তাতে সন্দেহ নেই। তাই নিউ-ইয়র্কের জননী পথে নেমেছেন তাঁর সন্তানের নিরাপত্তার দাবিতে, জাপানের যুবক দেশ থেকে আমেরিকান যুদ্ধ ঘাঁটি অপসারণের দাবিতে পথে পথে নেচেছে 'সর্প নৃত্য', সংশয়ী রাসেল অলডারম্যাস্টন মার্চের পর আজ মস্কোয় তীর্থযাত্রী হতে চেয়েছেন।

দল-মত, জাতি-বর্ণ, জীবিকা-সংস্থান নির্বিশেষে পৃথিবীর তাবৎ শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ তথা শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক ও জনসেবীর সর্বব্যাপী মনীষা ও আবেগের মিলন ঘটেছে এই সম্মেলনে।

ভারতবর্ষের শান্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকজনের এক

প্রতিনিধিমণ্ডলী এখন মস্কোতে। 'পরিচয়' সম্পাদক শ্রীগোপাল হালদার ও 'পরিচয়'গোষ্ঠীর শ্রীচিন্মোহন সেহানবিশ এই প্রতিনিধিমণ্ডলীর সঙ্গে আছেন।

সমস্ত পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আমরাও এই সম্মেলনের কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ কার্যসূচীর দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছি।

শুধু দুঃখ হয়, যে সম্মেলন পৃথিবীর সর্বত্র প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে—আমাদের দেশে, আমাদের সংস্কৃতিসেবী ও বুদ্ধিজীবী মহলে তা সবিশেষ সাড়া তোলে নি।

ইতিহাসের যে অভিপ্রায় আলজিরীয়া ও মস্কোয় প্রকাশিত, তার থেকে কবে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করব?

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

---

৩২ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে প্রতিবারের মতো এবারও

শ্রাবণ সংখ্যা বিশেষ সমালোচনা সংখ্যারূপে

প্রকাশিত হবে
